বিদ্যাসাগর ও পরমহংস

অমলকুমার রায়

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস

দর্শনে আদর্শ

অমলকুমার রায়

নবার্ক ॥ ডিসি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রকাশক : শ্রী প্রশান্ত মিত্র
নবার্ক। ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম নবার্ক সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৯৫, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

মুদ্রক : শ্রী অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী, (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ : শ্রী সৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭-১ বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬

দাম : পঁচিশ টাকা
£ 2·00
$ 3·50

ভূমিকা

"বিদ্যাসাগর ও পরমহংস" বইখানি ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখন সামান্য কিছু এবং মুখ্যতঃ বাচনিক, পরিবর্তন করিয়া ইহার পুনঃপ্রকাশ করা হইল। যাঁহারা দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখিয়া দেখিতে চান, তাঁহারা সম্ভবতঃ অভিনন্দন জানাইবেন।

যে উপনিষৎগুলি হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির নাম বর্তমান সংস্করণে দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে বইখানির ইংরাজি সংস্করণ ***Two Men and Two Paths*** নাম দিয়া রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

দুই একটি স্থলে সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সন্ধিবিচ্ছেদের ফলে কোনও কোনও পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, এই বিবেচনায়।

পুস্তকান্তর্গত উদ্ধৃতিগুলি এইভাবে গৃহীত— মানব ধর্মশাস্ত্রগত উদ্ধৃতি শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত মনুসংহিতা, নবম সংস্করণ হইতে, রামায়ণগত উদ্ধৃতি এন্ রামরত্নম্ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমদ্বাল্মীকি রামায়ণম্ (১৯৫৮ খ্রীঃ) হইতে, মহাভারতগত উদ্ধৃতি ঘনশ্যাম দাস জালান কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমন্মহাভারতম্ হইতে এবং *New Testament*-গত উদ্ধৃতি ***To-days English Vision*** (American Bible Society) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৫।১ ব্রজমণি দেব্যা রোড, পশ্চিম বড়িশা
কলকাতা ৭০০ ০৬১

অমলকুমার রায়

উৎসর্গ

শ্রীমতী শোভা রায়

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥"

বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১ ।
ঈশ ১৫ ।

"কঃ পন্থাঃ ? পথ কি ?" যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন। "মহাজনো যেন গতঃ, স পন্থাঃ," মহাজন যেদিক ধরিয়া গিয়াছেন, তাহাই পথ," উত্তর দিলেন যুধিষ্ঠির। যক্ষ সন্তুষ্ট হইলেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায়। মহাজন কে, তাঁহার স্বরূপ কি, কি লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে চেনা যায় ? যাঁহারা মনে ও মুখে "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" করিয়া ভিক্ষান্নজীবী হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সেই সাধু-সন্ন্যাসিগণই কি মহাজন, অথবা যাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুসন্ধানে বা মানবজাতির দুঃখদৈন্য লাঘবের প্রচেষ্টায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন সেই গৃহী কর্মী মহাপুরুষগণ মহাজন ? আমাদের আদর্শ কে— Jesus Christ (যীশু খ্রীষ্ট), চৈতন্য, রামকৃষ্ণ — না —Copernicus (কোপার্নিকাস্) Galileo (গ্যালিলেও), Newton (নিউটন্), Heny (হ্যা'ৎস্) Edison (এডিসন্) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক Howard (হাওয়ার্ড্), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মানবহিতব্রতী ? কাহার পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করিব ? আমাদের উদ্দেশ্য হইবে কি ঈশ্বর-লাভের চেষ্টায় নিষ্ক্রিয়তা, না, মনুষ্যত্বলাভের চেষ্টায় আত্মাহুতি ? পথ কি ? মহাজন কে ?

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সমালোচনায় পরমহংস

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ির একটি ঘরে রামকৃষ্ণ আহারান্তে ছোটো খাটটিতে উপবিষ্ট, ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ বলিলেন—

"বিদ্যাসাগরের এক কথায় তা'কে চিনেছি, কতদূর তা'র বুদ্ধির দৌড়। যখন বললুম, 'শক্তিবিশেষ' তখন বিদ্যাসাগর বোল্লে, 'মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশি, কারুকে কম, শক্তি দিয়েছেন ?' আমি অমনি বল্লুম, তা দিয়েছেন বইকি। বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বোলে ফেল্লে, 'তিনি কি কারুকে বেশি, কারুকে কম, শক্তি দিয়েছেন ?' কি জানো, জালে প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে ; রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন

চুনো পুঁটি পাঁকাল এইসব মাছ বেরোয়— একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হোলে কি হবে ?"

মাসখানেক পরে, ২২ জুলাই রামকৃষ্ণ অনুরূপভাবে দ্বিপ্রহরের আহারান্তে ভক্তমধ্যে সমাসীন। জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন,

"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেতো, এত বাইরের কাজ যা করছে সেসব কম পোড়ে যেতো, শেষে একেবারে ত্যাগ হোয়ে যেতো। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন একথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যানচিন্তায় মন যেতো।"

আরও মাস দুয়েক পরে, ২৬ সেপ্টেম্বর, রামকৃষ্ণ অনুরূপভাবে সমাসীন। বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটান্ ইন্স্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে রামকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন ? 'সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান —এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান'। সত্যতে থাকলে তবে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বোল্লে, এখানে আসবে। কিন্তু এলো না। পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ। শুধু পণ্ডিত যে, তা'র কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত শালারা বলে এক, আর করে এক।"

প্রায় দুই বৎসর পরে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মে, রামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তের বৈঠকখানা ঘরে ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া সহাস্যবদনে কথা কহিতে কহিতে বলিলেন—

"সাধনা চাই— শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। বিদ্যাসাগরকে দেখলুম —অনেক পড়া আছে। কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের স্বাদ পায় নাই। শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? ধারণা কই ? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না !"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত এই যে, বিদ্যাসাগরের পুঁথিগত পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান নাই, কর্মত্যাগ করিয়া ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন থাকাই মানুষের কর্তব্য এটুকু বোধ নাই, বিদ্যাসাগর আর পাঁচ শালা পণ্ডিতের মতো মিথ্যাবাদী। কথার ঠিক

নাই। রামকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তিনি নিজে যেভাবে ঈশ্বরের নাম ও চিন্তা সর্বস্ব জ্ঞানে নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করিয়া বসিয়া আছেন সেইটাই আদর্শ পথ, বিদ্যাসাগরের উচিত ছিল সেই পথ অবলম্বন করা, তাহা না করায় বিদ্যাসাগর মানুষটি আসলে কিছুই নয়।

খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের এই দুইটি পথিক যে পরস্পর-বিপরীত পথ ধরিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথ দুইটি পরিক্রমণ করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিব।

বিদ্যাসাগরের জন্ম— ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ ১২ আশ্বিন ১২২৭ বঙ্গাব্দ। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন দরিদ্র পরিবারে পণ্ডিতকুলে। দুইজন পুরুষের কর্তব্যবিমুখতা সে সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারটির উপর ছায়া ফেলিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও পারিবারিক কারণে ভ্রাতাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা ফেলিয়া পরিব্রাজকবৃত্তি অবলম্বন করেন। ফলে, পত্নী দুর্গা দেবী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বনমালিপুরে শ্বশুরের গৃহত্যাগ করিয়া কয়েক মাইল দূরে ঐ জেলারই মধ্যে বীরসিংহ নামক গ্রামে পিতার গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে না পারিয়া অসাধারণ উদ্যম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখাইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস অবশেষে কলিকাতায় কোনও সওদাগরের গদিতে সামান্য বেতনে চাকরি গ্রহণ করেন। অল্পশিক্ষিত কঠোর সৎপথচারী এই মানুষটি কোনোদিনই লক্ষ্মীর কৃপা পান নাই। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সময়ে ইঁহার সংসার কোনো রকমে কষ্টে চলিয়া যাইত— নিজে কলিকাতায় জগদ্দুর্লভ সিংহ নামক জনৈক সদাশয় বণিকের গৃহে বাস করিয়া চাকরি করিতেন, এবং মাতা ও পত্নী ভগবতী দেবী থাকিতেন বীরসিংহ গ্রামে।

ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহ রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও কিছু দিন সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিয়া পরিবার প্রতিপালনে বিমুখ হইয়া উঠেন। তিনি শবসাধনা আরম্ভ করিলেন এবং সংসারের সকল বিষয়ে উদাসীন হইলেন। ফলে, তাঁহার সংসার অচল হইয়া পড়ায় বৃদ্ধ শ্বশুর পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশকে সপরিবারে জামাতার ভরণপোষণভার স্কন্ধে লইতে হইল। বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী এইভাবে স্বীয় মাতুলালয়েই পালিত হইয়া-

ছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর মাতুলালয় বলিতে মাতার মাতুলালয়ই বুঝিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা

ঠাকুরদাস বাল্যে অন্নকষ্ট পাইলেন ও উচ্চশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইলেন। এইজন্য অপরের অন্নকষ্ট দূর করিবার ও পুত্রদের উচ্চশিক্ষিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। প্রথমে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক গ্রাম্য পণ্ডিতের নিকট পাঠ শেষ হইলে, আট নয় বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য ঠাকুরদাস কলিকাতায় আনিয়া সরকারি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। সে সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ এই তুইটি সরকারি বিদ্যাভবনে যথাক্রমে শুধু সংস্কৃত ও শুধু ইংরাজিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। সংস্কৃত কলেজে বেতন লাগিত না, হিন্দু কলেজে উচ্চহারে বেতন দিতে হইত। সংস্কৃত পণ্ডিত-বংশের সন্তান ঠাকুরদাস পুত্রের জন্য সংস্কৃত কলেজ গ্রহণ করিলেন। সংস্কৃত কলেজে পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাকালে সম্ভবতঃ নিজ জীবনের ব্যর্থতায় ক্ষোভের প্রতিক্রিয়াবশে ঠাকুরদাস পুত্রের প্রতি সময়ে সময়ে নির্মম ব্যবহারও করিয়াছেন। রাত্রি নয়টার পর চাকরির দৈনিক কাজ শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়া যদি দেখিতেন যে বালক-পুত্র নিদ্রিত, তাহা হইলে অমানুষিকভাবে প্রহার করিতেন। যে ঠাকুরদাস বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিবার কালে অনেক পথ পুত্রকে স্কন্ধে বহিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন, উদরাময়ে পীড়িত পুত্রের মল স্বহস্তে পরিষ্কার করেন, তিনিই সেই পুত্রকে রাত্রি নয়টার পরেও জাগিয়া পড়াশুনা করে না কেন, এই কারণে প্রহার করেন, এই কথা ভাবিলে বিস্ময় হইতে পারে। ঠাকুরদাস হয়তো মনে করিতেন, অবস্থাবৈগুণ্যে যে উচ্চশিক্ষালাভে তিনি নিজে বঞ্চিত, সেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পুত্রকে দিয়াছেন, পুত্রের ভিতর নিজের জীবনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন, এইবার দিবারাত্র জাগিয়া পড়াশুনা করিতে হইবে, রাত্রি জাগিয়া পড়া হইতেছে না দেখিয়া তিনি যেন প্রহার করিতেন নিজেকেই—ভুলিয়া যাইতেন যে, যাহাকে প্রহার করিতেছেন সে তিনি স্বয়ং নহেন, একটি শিশু মাত্র।

বিদ্যাসাগরও নিশ্চয় পিতার অন্তরের বেদনার কথা বুঝিয়াছিলেন। চক্ষে সরিষার তেল দিয়া রাত্রি জাগিয়া কঠোর বিদ্যাভ্যাস করিয়া এবং

এগারো-বারো বৎসর বয়স হইতে বাসায় পাচক-ভৃত্যের কাজ স্বহস্তে করিয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষায় পারদর্শিতা লাভের ফলে অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট উপাধি লাভ করেন "বিদ্যাসাগর", এবং কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিবার অল্প দিন পরেই, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, কলিকাতায় (Fort William College-এ) ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম পাইয়া তাঁহার প্রথম কাজ হইল পিতাকে চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দেশে পাঠাইয়া দেওয়া।

বিদ্যাসাগরের সরকারি চাকরি

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামক বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন বৃটিশ ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর্-জেনারল্ (Governor-General) লর্ড ওয়েলেস্‌লি (Lord Wellesley) ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি (East India Company)-র তরুণ ইংরাজ কর্মচারী-দিগকে এদেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে। ঐ কলেজের সেরেস্তাদারের বা প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পদ প্রাপ্ত হন। তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ঐ চাকরি করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র গৃহশিক্ষকের ও বন্ধুদের সাহায্যে হিন্দী ভাষা ও ইংরেজি ভাষা রীতি-মতো আয়ত্ত করিয়া লন। এইভাবে নিজের উদ্যমে ইংরাজি ভাষা শিক্ষাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয়। ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজি শিক্ষা চাকরি জীবনে উন্নতির একমাত্র সোপান, একথা ঈশ্বরচন্দ্র জানিতেন।

বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরি করেন মোট প্রায় পনের বৎসর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নোভেম্বার মাস পর্যন্ত— মধ্যে প্রায় দুই বৎসর বাদ যায় স্বেচ্ছায় পদত্যাগের দরুন। সরকারি চাকরি করিতে করিতেই তিনি করেন, যাহা তিনি স্বীয় "জীবনের সর্বপ্রধান সৎকার্য" বলিয়া ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের নিকট লিখিত পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, হিন্দু বিধবাবিবাহ আইন পাস করানো ও বর্তমান যুগে প্রথম উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ দেওয়া।

বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ

হিন্দু বিধবাবিবাহ-আন্দোলন যে প্রথম বিদ্যাসাগর করেন, এমন নয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে রাজা রাজবল্লভ এবিষয়ে চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। ঊনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগর আন্দোলন সুরু করিবার কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণও এ বিষয়ে আন্দোলন তুলিয়া বিফল হন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নব্য ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণ কলিকাতায় *Bengal Spectator* (বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর্) নামে যে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেও বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা সম্পর্কে বিচার হ'ল। চেষ্টায় বিদ্যাসাগর প্রথম নন, কিন্তু সাফল্যে তিনি প্রথম।

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর অন্তরে প্রেরণা পান স্বগ্রামবাসিনী বিধবা বালিকাদের উপবাসাদি কষ্ট দেখিয়া ও বিধবাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ-হত্যার কাহিনী শুনিয়া। সর্বশেষ প্রেরণা পান নিজ মাতাপিতার নিকট। এবিষয়ে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তৎপ্রণীত "বিদ্যাসাগর জীবনচরিত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"এক দিবস বীরসিংহ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রজ পিতৃ-দেবের সহিত বীরসিংহের বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কিনা?' কথোপকথনে অবশেষে স্থির হইল যে, বিদ্যাসাগর ধর্মশাস্ত্রগুলি আরও ভালো করিয়া দেখিয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুগ বুঝিলে সে বিষয়ে পুস্তক প্রচার করিবেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগর প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থগুলির মধ্যে কেবল মনুস্মৃতি পড়িয়াছিলেন, কিন্তু মনুস্মৃতির যে-সংস্করণ তৎকালে তথা বর্তমানকালে প্রচারিত, তাহাতে বিধবাবিবাহের প্রকাশ্য সমর্থনে কোনও শ্লোক নাই। পিতার অনুজ্ঞায় তিনি অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থও পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পড়িতে পড়িতে একদিন পরাশর স্মৃতির পত্যন্তর গ্রহণ বিষয়ক শ্লোকটি পাইলেন; পাইয়াই নিকটে উপবিষ্ট বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "পাইয়াছি, পাইয়াছি"। পরাশরস্মৃতির শ্লোকটি এই—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥—

অর্থাৎ পতি যদি নিরুদ্দিষ্ট হন, মৃত হন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, ক্লীব হন বা পতিত হন, তাহা হইলে নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারেন। বিদ্যাসাগর এই পরাশরস্মৃতিগত শ্লোকটি আবিষ্কার করেন ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে। ইহার পরে আরও কিছু পড়াশুনা করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যাসাগর প্রথম প্রকাশ করেন, তাঁহার "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তিকা। এই পুস্তিকা প্রকাশের ফলে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিরাট বাদানু-বাদের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবাদ-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। প্রতিবাদের প্রতি-বাদ স্বরূপ বিদ্যাসাগর কয়েকমাস পরে "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব— দ্বিতীয় পুস্তক" নাম দিয়া অপর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এবং ইংরাজ রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই দ্বিতীয় পুস্তিকাটির ইংরাজি অনুবাদ "Marriage of Hindu Widows" নাম দিয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তিনি অনুভব করিলেন যে, দেশে যেক্ষেত্রে ইংরাজের শাসন, সেক্ষেত্রে ইংরাজের দ্বারা হিন্দুবিবাহের সমর্থনে আইন পাস করাইয়া লইতে পারিলেই তিনি বিরোধী দলের উপর জয়লাভ করিবেন— প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে ইংরাজেরা আইন করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার স্মরণে ছিল। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র রাজসরকারে পেশ করিলেন। অবশেষে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, "an Act to remove all legal obs-tacles to the marriage of Hindu Widows" অর্থাৎ হিন্দু-বিধবাগণের বিবাহে যাবতীয় বিধিগত বাধা অপসারণের নিমিত্ত বিধি-পত্র, সংক্ষেপে হিন্দু-বিধবাবিবাহ আইন পাস হইল, ২৫ জুলাই হইতে উহা বলবৎ হইল। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ছত্রিশ বৎসর। এবং তিনি সরকারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টর্‌ অর্থাৎ পরিদর্শক। কয়েক মাসের মধ্যেই উদ্যোগী হইয়া নিজের খরচে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ দিতে আরম্ভ করিলেন।

বিধবাবিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর যেমন একদিকে কয়েকজন

শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছিলেন, অপরদিকে অনেকের তীব্র বিরোধিতা ও নিন্দা ভোগ করিয়াছিলেন। লোকে ঠাট্টা করিয়া ছড়া বাঁধিয়াছিল—

বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হোয়ে

* * * *

ঠাকুরপোরে কোরবো বিয়ে ঠাকুরঝিরে বোলে কোয়ে।

বিধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের তিনটি ভুল হইয়াছিল— প্রথমতঃ তথ্যগত, দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারগত, তৃতীয়তঃ চালের ভুল বা দূরদৃষ্টির অভাব। তথ্যগত ভুল এই যে, বিদ্যাসাগর মনে করিলেন যে হিন্দুবিধবাবিবাহ তাঁহার ঐকালেও শাস্ত্রসম্মত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেকালে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ছিল না। প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রও প্রচলিত ছিল, শুধু বিধবা কেন, সধবা নারীও পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন ক্ষেত্রবিশেষে— পতি ক্লীব হইলে, নিরুদ্দিষ্ট হইলে, পতিত হইলে বা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে। "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি যে শ্লোকটি বিদ্যাসাগর পরাশরস্মৃতির মধ্যে পাইয়াছিলেন (এবং যেটি নারদস্মৃতিতেও বিদ্যমান) সেটি, আমাদের মতে, মনুস্মৃতির আদি সংস্করণেও ছিল।[১] মনুস্মৃতি বা মানবধর্মশাস্ত্রই ভারতীয় আর্যগণের বিধিসংক্রান্ত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু কালক্রমে বিবাহিত নারীর পুনর্বিবাহ হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ হয়। এবং মনুস্মৃতি হইতে "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোকটি বর্জিত হয়। বিদ্যাসাগরের সময়ে অবস্থা এইরূপ ছিল। ভারতীয় আর্যগণের শাস্ত্রশাসনের পরিধির বাহিরে যাঁহারা ছিলেন, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা, যথা, ডুলে, হাড়ি প্রভৃতি, ইঁহাদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ ও বিবাহিত নারীর পুনর্বিবাহ চিরকাল প্রচলিত ছিল, বিদ্যাসাগরের সময়েও ছিল। বর্ণাশ্রমীদের পক্ষে উহা বিদ্যাসাগরের সময়ে অপ্রচলিত ও অশাস্ত্রীয় ছিল। বিদ্যাসাগর মুখ্যতঃ পরাশরস্মৃতির শ্লোকটির উপর নির্ভর করিয়া মনে করিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, পরাশরস্মৃতি বা নারদস্মৃতি হিন্দুগণের বিধি বিষয়ে প্রামাণ্য নয়। বিদ্যাসাগর যেন একটি repealed statute অর্থাৎ রহিত করা বিধিপত্রকে প্রচলিত বিধি বলিয়া উপস্থিত করিলেন। বিদ্যাসাগর যদি বলিতেন যে, বিধবাবিবাহ আইনসম্মত হইয়া উঠিত, উহা হইত

স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু তিনি বলিলেন, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত—এই-খানেই তাঁহার ভুল, তিনি বলিলেন, শাস্ত্রে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কেবল দেশাচারে নিষিদ্ধ, এবং এই বলিয়া দেশাচারের উপর গালি পাড়িলেন। তিনি ভুলিয়া গেলেন যে, দেশাচার আইন, ব্যবহারো হি বলবান্, ধর্মস্তেনা বহীয়তে। পূর্বকালে সর্বত্র দেশাচারই বিধি ছিল, ভারতের ধর্মশাস্ত্র ও দেশাচারের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমে যাহা দেশাচার, পরে তাহাই শাস্ত্রাচার। হৃদয়ের আবেগ বিদ্যাসাগরের বুদ্ধি-বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মনে করিয়াছিলেন যে, বিধবাবিবাহ ইংরাজি আইন-সম্মত করিলেই উহা চালু হইবে। এই ধারণা তাঁহার দ্বিতীয় ভুল। সাধারণতঃ বিবাহযোগ্য কুমারীর সংখ্যাই এত অধিক যে, বিধবাদের বিবাহের সম্ভাবনা খুবই অল্প। কুমারীকে অবিবাহিত রাখিয়া তাঁহার স্থলে বিধবার বিবাহ দেওয়া কেহই সমর্থন করিবেন না, এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁহার সামান্যমাত্রও জ্ঞান আছে তিনি স্বীকার করিবেন যে, কুমারী ও বিধবার মধ্যে বিবাহক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় লোকে কুমারীকেই যোগ্যতর স্থান দেন। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া আইন চালু থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহের সংখ্যা নগণ্য। বিদ্যাসাগর যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, কত বয়স্ক বিধবা বিবাহের পরিবর্তে গোপনে পুরুষসংসর্গ করিতেছেন ও ভ্রূণ হত্যা করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের সময়ে যে সমস্যা ছিল, সেটি বিধবাবিবাহ সমস্যা নয়, সেটি বালবিবাহ— বালবিধবা সমস্যা ; এবং ইহা নিরাকরণের উপায় ছিল নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, তাঁহাদের স্বাধীন জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করা, বাল-বিবাহের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রচারকার্য করা, এবং বিবাহের নিম্নতম বয়স আইন করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া। অবশ্য, আইন করিয়া বিধবা-বিবাহের পথে বাধা অপসারণের প্রয়োজনও ছিল ; যেক্ষেত্রে কোনও পুরুষ ও কোনও নারী উভয়েই ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে তাঁহারা অননুমোদিত-ভাবে সংসর্গ না করিয়া বিদ্যাসাগরীয় আইনের সাহায্যে আইনসম্মত-ভাবে বিবাহিত জীবনযাপন করিতে পারিবেন। বিদ্রোহের প্রয়োজন দূর করিয়া এ ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণকর।

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভুল, মানুষের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভরতা।

(পরবর্তী কালের) সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে বিদ্যাসাগর বলিতেছেন —

"তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয় নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম। কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এসকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্যদান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।...অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্যদান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্ধমাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্ধ এপর্যন্ত দাও নাই এবং কিছুদিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ।...আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ (সংক্রান্ত গ্রন্থ) ও আইন প্রচার পর্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়াও এবিষয়ে সংবাদ লয়েন না।" দূরদৃষ্টির অভাবে বিদ্যাসাগর বিব্রত।

বিধবাবিবাহব্যাপারে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ প্রকাশ পায়— গোঁ, জেদ বা obduracy। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বড় একগুঁয়ে ; পিতা বলিলেন, "ফর্সা কাপড় পরিয়া কলেজে যাও", শুনিয়া একটু পরে বলিলেন, "ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব", এবং তাই গেলেন ; পিতা বলিলেন, "আজ স্নান করো", কিছুতেই করিবেন না। বিধবাবিবাহ ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর অনুরূপ গোঁ দেখাইয়াছেন, পরমহিতৈষী গুরুর বাক্যও লঙ্ঘন করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, তখন তাঁহার অন্যতম শিক্ষক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ একটি মূল্যবান্ হস্তলিখিত পুঁথি ক্লাসে বসিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন, বাড়ি লইয়া যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র এই নিষেধ না শুনিয়া পুঁথিটির কয়েকটি পাতা গোপনে বাড়ি লইয়া যাইবার সময়ে পা

পিছলাইয়া জলকাদার মধ্যে পড়িয়া যান। সিক্ত পাতাগুলি যখন ঈশ্বরচন্দ্র একটি দোকানে বসিয়া আগুনে সেঁকিতেছিলেন, সে-সময়ে তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিজের গায়ের উড়ানি পরিতে দেন ও গাড়ি করিয়া বাসায় রাখিয়া আসেন। এই স্নেহময় অধ্যাপক যখন শুনিলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে উদ্যোগী হইয়া বিধবাবিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন তিনি দেখা করিয়া বলিলেন, "ভবিষ্যতে বিধবাবিবাহ দেওয়ার পথ তুমি পরিষ্কার ক'রে দিয়েছ ; তোমাকেই যে বিধবাবিবাহ দেওয়াতে হবে, এমন কথা নয় ; বিধবাবিবাহ দেওয়ানো ব্যয়সাধ্য কাজ, তোমার টাকা কোথায়? কলিকাতাবাসী অল্পবয়স্ক অপরিণামদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকদের কথায় নির্ভর কোরে এই গুরুতর কাজে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।" নিজের জেদের বশে বিদ্যাসাগর এই অমূল্য উপদেশ অগ্রাহ্য করেন। ফলে, তর্কবাগীশ যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপই ঘটিল, এবং বিদ্যাসাগরকে "ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম" বলিয়া অনুশোচনা করিতে হইল।

অত্যধিক একগুঁয়েমি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের স্বাভাবিক নির্মলতায় আবিলতা আনিয়া দিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের স্বার্থত্যাগেরও চেষ্টার ফলে তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ পান। এই অধ্যাপক তারানাথ "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা, এতদ্বিষয়ক বিচার" নামক বিদ্যাসাগর কর্তৃক রচিত একটি আলোচনা পুস্তকের প্রতিবাদে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে বিদ্যাসাগর বেনামায় যে পাল্টা প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তারানাথের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণে নিন্দনীয় রুচি প্রকাশ পাইয়াছে। "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" প্রণীত "অতি অল্প হইল" নামের পুস্তকে বিদ্যাসাগর লিখিলেন,

এতকাল পরে সব ভেঙে গেল ভুর।
হতদর্প হৈলে বাচস্পতি বাহাদুর॥

* * * *

তুমি গো পণ্ডিতমূর্খ বুদ্ধিশুদ্ধিহীন।
অতি অপদার্থ তুমি অতি অর্বাচীন॥

এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম, তারানাথ তর্কবাচস্পতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। আজকাল শুনিতেছি তাঁর যত বড় নাম ও যত ধুমধাম, তত

বিদ্যা ও তত জ্ঞান নাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া একখানি বহি লিখিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি খুড় তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একখানি বহি বাহির করেন। বিদ্যাসাগর তাহার জবাব লিখিয়া আবার একখানি বহি বাহির করিয়াছেন। সেই বহি পড়িয়া সবাই বলিতেছে, এবার তারানাথের দফা রফা হয়েছে। সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাই ত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়।"

এই তারানাথ তর্কবাচস্পতিই বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়নের সময়ে বিদ্যাসাগরকে বহুভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং বিদ্যাসাগর সে সময়ে তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় তারানাথকে "সর্বশাস্ত্রবিশারদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তারানাথ পণ্ডিত হন বা না হন কোনও আইন-গত প্রশ্নের বা যে-কোনও প্রশ্নের বিচারের সময়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ কুরুচির পরিচায়ক। এখানে বিচার্যবস্তু ছাড়িয়া লক্ষ্য হইয়াছে প্রতি-পক্ষের চরিত্র বা বিদ্যাবত্তা। বল্ ছাড়িয়া লক্ষ্য হইয়াছে গোল্‌কীপার্। উইকেট ছাড়িয়া লক্ষ্য হইয়াছে ব্যাট্‌স্‌ম্যান্। অবশ্য খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় সাহিত্যে এই রীতির উদাহরণ আরও আছে।

বিদ্যাসাগরের চাকরি-জীবন

বিদ্যাসাগরের চাকরি-জীবন শুরু হইয়াছিল শিক্ষা-বিভাগে—তিনি শিক্ষক, বিদ্যালয়ের পরিচালক, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষক হিসাবেই তাঁহার চাকরির সূত্রপাত—ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে। এই পদে চার বৎসরের কিছু উপর থাকিয়া অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রল মাসে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটরী হইয়া যান। ইহার পরে ১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ করা ভিন্ন আর বিশেষ অধ্যাপনা করেন নাই। শিক্ষক হিসাবে বিদ্যাসাগর উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন বোধ করেন, এবং বাংলা সংস্কৃত ভাষায় একাধিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন বা সঙ্কলন করেন। উদ্যোগী পুরুষ বিদ্যাসাগরের প্রথম সাহিত্য রচনা ব্যাপারেও উদ্যম ও অধ্যবসায়ের কাহিনী আছে। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের বৃটিশ ছাত্রদিগের পাঠোপ-যোগী বাংলা পুস্তকের কিছু অভাব ছিল। সেই অভাব দূর করার জন্য

কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিদ্যাসাগর "বাসুদেব-চারত" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। এইটি তাঁহার প্রথম পুস্তক, কিন্তু কর্তৃপক্ষ এটি পছন্দ করেন নাই এবং ইহা প্রকাশিতও হয় নাই। কিছুকাল পরে পুনর্বার অনুরুদ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর "বেতাল-পঞ্চবিংশতি' নামে অনুবাদ [illegible] রচনা করেন। বইখানি কলেজের কর্তৃপক্ষ রেভারেণ্ড কৃষ্ণ[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেন বিবেচনার জন্য। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের নিকট বইটি ভালো লাগে নাই। দ্বিতীয় চেষ্টাও নিষ্ফল হয়! কিন্তু বিদ্যাসাগর নিরুৎসাহ না হইয়া শ্রীরামপুরের পাদ্রি Marshman (মার্শম্যান্) সাহেবকে দেখাইয়া ইঁহার নিকট বইখানির উচ্চ প্রশংসাপত্র আদায় করেন; এবং প্রশংসাপত্রের ফলেই "বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের পাঠ্যরূপে গৃহীত হয়। বর্তমান বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান শিল্পীর বাংলা গ্রন্থ সাহেবকে দিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হয়, এবং ইহা বেশিদিনের কথাও নয়— ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের, মাত্র এক শতক পূর্বের!

বিদ্যালয় পরিচালক ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা রূপেও বিদ্যাসাগর কর্মদক্ষতা ও উদ্যম দেখাইয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক, অধ্যাপনা করা অপেক্ষা তত্ত্বাবধানের কাজ করা বোধ হয় বিদ্যাসাগরের অধিক প্রিয় ছিল, এবং চাকরি-জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি শিক্ষাবিভাগে তত্ত্বাবধানের কাজই করিয়া গিয়াছেন—সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরি রূপে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রল হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত, এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি হইতে ও তদুপরি বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মে হইতে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করা পর্যন্ত। সংস্কৃত কলেজে সে সময়ে কোনই শৃঙ্খলা ছিল না। এবং কলেজের অধ্যাপকবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহারই পূর্বতন শিক্ষক। তথাপি, এই সঙ্কোচের অবস্থার মধ্যে, তিনি দৃঢ়তা ও ধীরতার সহিত বিশৃঙ্খলার স্থলে আনেন কঠোর রীতি, পাশাপাশি বৃটিশ-পরিচালিত হিন্দু কলেজেরই মতো। বিদ্যালয়পরিদর্শকরূপে তিনি হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন স্থানে সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সেগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখি[illegible]ন। এ বিষয়ে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে টিউটন-জাতিসুলভ ছিল

বিদ্যাসাগর চাকরি করিয়াছেন, কিন্তু চাকরের মনোভাব অবলম্বন করেন নাই। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সাহেবদের সহিত সমান পাল্লা দিয়া চলিয়াছেন, আত্মসম্মানের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে মাথা নিচু করেন নাই। সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরি থাকা কালে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের সহিত প্রয়োজনবশতঃ দেখা করিতে গেলে, সাহেব অধ্যক্ষ টেবিলের উপরে পা তুলিয়া রাখিয়া তাঁহার সহিত কথা বলেন ; পরে, ঐ সাহেব তাঁহার সহিত সংস্কৃত কলেজে দেখা করিতে গেলে তিনি অনুরূপ আচরণ করেন। চাকরি-জীবনের শেষ দিকে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে প্রতি বৃহস্পতিবার Lieutenant Governor Sir Fredrick Halliday-র (লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্নর হ্যালিডের) সহিত দেখা করিতে হইত ; লাট-সাহেবের আদেশে বার তিন-চার য়ুরোপীয় পোষাক পরিয়া দেখা করিয়া শেষে ঐরূপ পোষাক পরিতে অস্বীকার করিলেন, এবং লাটসাহেব বাধ্য হইলেন ধুতিপরিহিত বিদ্যাসাগরকে দর্শন দিতে। If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must go to the mountain, এই কয়বার ভিন্ন তিনি আজীবন মোটা কাপড়, মোটা গায়ের চাদর ও তালতলার চটি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার মিউজিয়ম বা যাদুঘর দেখাইতে গেলেন, দারোআন বাধা দিলেন, চটি পায়ে দিয়া ভিতরে প্রবেশ নিষেধ ; পত্রযুদ্ধ করিয়া সর্বসাধারণের জন্য চটি পায়ে দিয়া প্রবেশাধিকার আদায় করিতে না পারিয়া তিনি আর মিউজিয়ম-ভবনে পদার্পণ করেন নাই।

চাকরি ত্যাগ

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নোভেম্বার মাসে বিদ্যাসাগর স্বেচ্ছায় সরকারি কাজে ইস্তফা দেন। ইহার পূর্বে, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, তিনি একবার পদত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে প্রায় দুই বৎসর সরকারি চাকরিতে ছিলেন না। ঐ পদত্যাগের সময়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটরি। সংস্কৃত কলেজের সর্বপ্রধান কর্মচারী তখন সেক্রেটরি রসময় দত্ত। রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরি হওয়া ভিন্ন ঐ সময়ে Court of Small causes of Calcutta-র

কলিকাতার ছোট আদালতের অন্যতম বিচারপতিও ছিলেন। ইনি পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ তরু দত্তের পিতামহ, যে তরু দত্ত অল্প বয়সে ইংরাজি ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। রসময় দত্তের বিশেষ আগ্রহেই বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের সেরেস্তাদারের পদ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টন্ট্ সেক্রেটরির পদ গ্রহণ করেন। কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সামান্য মতদ্বৈধের ফলে বিদ্যাসাগর ঐ কর্ম পরিত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ও শেষবারে যখন বিদ্যাসাগর সরকারি কর্ম ত্যাগ করেন, তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দক্ষিণবঙ্গের বিদ্যালয়-সমূহের স্পেশল্ ইন্স্পেক্টর। এবার পদত্যাগের কারণ, তাঁহার উপযুক্ত পদোন্নতি হইতেছে না এবং তিনি উপরিতন কর্মচারীর নিকট কাজে বাধা পাইতেছেন, এইরূপ ধারণা।

দুইবার পদত্যাগই কিছু পরিমাণে বিদ্যাসাগরের অত্যধিক আত্মাভিমানের বা আত্মকেন্দ্রিকতার ফল। জেদের বশে সকলের উপদেশ পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া হঠাৎ কর্মত্যাগের পরে বিদ্যাসাগরকে পুনরায় সরকারি চাকরির জন্য আবেদন জানাইতে হইয়াছিল। দ্বিতীয়বারের পদত্যাগের কিছু পরে, অর্থের অনটনে তিনি দুইবার তদানীন্তন ছোট-লাট 'Sir Cecil Beadon (বীড্ন্) সাহেবকে অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। কিন্তু সরকারি চাকরি আর হয় নাই।

অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতার ফলে বিদ্যাসাগর পাঁচজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত কিছুকাল সংশ্লিষ্ট থাকিলেন, কিন্তু টিকিতে পারিলেন না। Hindu Family Annuity Fund (হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানিয়ুটি ফাণ্ড্) নামে বীমা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নিজেই বাহির হইয়া আসিলেন। তৎকালের সারস্বত সম্মেলনে বা অন্য কোনও সাহিত্য সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুরোধ সত্ত্বেও Indian Association-এ অর্থাৎ ভারতসভায় যোগ দেন নাই। এ-বিষয়ে তিনি রাজনারায়ণ বসুর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন।

এই অত্যধিক আত্মকেন্দ্রিকতার দরুন বিদ্যাসাগর নষ্ট বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধার করিতে কখনও মনোযোগী হইতেন না। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক

মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। মহেন্দ্রলাল নিজে একবার দারুণ পীড়িত হইলে বিদ্যাসাগর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছেন, যখনই মহেন্দ্রলাল চৈতন্যলাভ করিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর শয্যাপার্শ্বে আসীন। সেই মহেন্দ্রলাল যখন একবার অসাবধানতাবশতঃ বিদ্যাসাগরের মনে আঘাত দেন, ইহার পরে সমস্ত বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়।

মনে হইতে পারে যে, এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্যই বিদ্যাসাগর কখনও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন নাই। সে সময়ে অবশ্য বাঙালী-দের মধ্যে জাতীয়তাভাব বিশেষ প্রকট হয় নাই, তবে, কিছু কিছু ফুটিয়া উঠিতেছিল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে Indian National Congress-এর (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের) প্রতিষ্ঠায়। বিদ্যাসাগর এই দুইটির কোনওটির সহিত সংস্রব রাখেন নাই। তিনি আমরণ বৃটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের থাকিবার স্থান দরকার; তিনি সেজন্য অধ্যক্ষরূপে নিজ দায়িত্বে সংস্কৃত কলেজ ভবন ছাড়িয়া দিলেন, উপরিতন কর্তৃপক্ষ Director of Public Instruction-এর অর্থাৎ সরকারি শিক্ষা নির্দেশকের অনুমতির অপেক্ষা পর্যন্ত করিলেন না। বিদ্রোহী সিপাহিরা বিধবাবিবাহের উপর চটা, বিদ্যাসাগর সাময়িকভাবে বিধবাবিবাহ দেওয়া বন্ধ রাখিলেন। তবে, এইজাতীয় আচরণের কারণ আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে না খুঁজিয়া বিদ্যাসাগরের মনের অন্য এক দিকে খোঁজাই সঙ্গত। তাঁহার মন মানুষে মানুষে পার্থক্য করিতে পারিত না, ধর্মের গণ্ডি, জাতের গণ্ডি, জাতির গণ্ডি, স্বদেশী-বিদেশীর গণ্ডি বুঝিত না, উহা বিস্তৃত ছিল মানবতার ক্ষেত্রে। তাঁহার কর্মের গতি ছিল humanism মানবিকতা। জাতীয়তাবোধে মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতাবোধ থাকায় উহা সম্ভবতঃ তাঁহার অন্তঃকরণে নাড়া দিতে পারিত না।

পদত্যাগের পরে

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নোভেম্বর মাসে যখন দ্বিতীয় বারের তথা শেষ বারের মতো সরকারি কর্ম পরিত্যাগ করেন, তখন বিদ্যাসাগরের বয়স আটত্রিশ বৎসর। তাহার পরে সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর তিনি বাঁচিয়া

ছিলেন। চাকরি-জীবনে জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে যে ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, স্বাধীন জীবনেও তিনি সেইভাবে শিক্ষাবিস্তারে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। নিজ ব্যয়ে বহু বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। বিশেষ করিয়া, কলিকাতা নগরীতে একটি নূতন বিদ্যালয়ের স্থাপনা করিলেন. নাম রাখিলেন Metropolitan Institution (মেট্রপলিটন্ ইন্‌স্টিটিউশন্)। পরে এটিকে একটি উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রে বা কলেজে পরিণত করেন, নাম করেন Metropolitan College মেট্রপলিটন্ কলেজ। বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত, বাঙালী-পরিচালিত সরকারি সাহায্য নিরপেক্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এইটিই প্রথম। ইহা আজও বাঁচিয়া আছে, এবং বর্তমানে বিদ্যাসাগরের নামে বিদ্যাসাগর কলেজ বলিয়া পরিচিত।

এই দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর কাল পরিবার এবং আশ্রিতবর্গ সহ তিনি জীবিকানির্বাহের জন্য নির্ভর করিয়াছিলেন, প্রথমদিকে নিজের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত প্রেস নামক মুদ্রাযন্ত্র হইতে লব্ধ আয়ের উপর ও নিজের লেখা পুস্তক বিক্রয়ের আয়ের উপর, এবং শেষে প্রেসের স্বত্ব চলিয়া যাওয়ায় কেবল পুস্তক বিক্রয়ের আয়ের উপর। শিক্ষাবিস্তারের আনুষঙ্গিক হিসাবে তিনি পুস্তক-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবিকার আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। চাকরি ত্যাগের পরেও তিনি "সীতার বনবাস" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রেসের আয় ও পুস্তকের আয় যদি না থাকিত, তাহা হইলে দ্বিতীয়বারের পরে হয়তো বিদ্যাসাগরকে সত্যসত্যই "আলুপটোল বেচিয়া" খাইতে হইত— যেকথা তিনি প্রথম বারের পদত্যাগের পরে জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে কথার কথা হিসাবে বলিয়াছিলেন— কিন্তু তাহা হইলে আলুপটোল বিক্রেতা বিদ্যাসাগরের মধ্যে সাগরকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইত। শুধু হৃদয় থাকিলে হয় না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কর্মের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে এবং যশের পরিধি তদনুগ হয়।

তবে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের রসপিপাসুকে মনে রাখিতে হইবে যে, জীবিকার দ্বিতীয় প্রশস্ত পন্থা আছে, আলুপটোল বেচিয়া খাইতে হইবে না, একথা জানিয়াই বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। উন্মত্তের মতো কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পদত্যাগ দুইবারের একবারও করেন নাই। সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটরির পদ যখন ত্যাগ করেন, তখন তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে

বাংলা বিভাগে সেরেস্তাদারের পদে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেছেন, কাজেই তাঁহাকে পিতামাতা সমেত সপরিবারে উপবাস করিতে হইবে না। বাস্তবিক তিনি যখন রসময় দত্তের অনুরোধে নিজে ঐ সেরেস্তাদারের পদত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টণ্ট সেক্রেটরির পদ গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই শর্তই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধুকে তাঁহার পরিত্যক্ত পদটি দিতে হইবে, যাহাতে সেক্রেটরির সহিত মতবিরোধে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইলে পরিবার অনাহারে মারা না যায়। শেষবারের পদত্যাগ যখন করিলেন, তখন সরকারি চাকরির মাসিক পাঁচ শত টাকা আয় চলিয়া গেলেও সংস্কৃত প্রেসের আয় ও পুস্তকাবলীর বিক্রয়লব্ধ আয় রহিল, একথা তিনি বুঝিতেন।

পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয় তাঁহার প্রচুর ছিল। তাঁহার রচিত "বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ভাগ", "বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগ", "বোধোদয়", "কথামালা" আদি পুস্তক তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরেও প্রথম বাংলা-ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য ছিল, তাঁহার "ব্যাকরণ কৌমুদী" প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থী বাঙালীর নিকট অদ্যাপি অপরিহার্য। প্রভূত বদান্যতা সত্ত্বেও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই (১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৩ শ্রাবণ) তারিখে তিনি যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তখন কলিকাতায় বাদুড়বাগানে ও বিহারের অন্তর্গত কার্মাটারে নিজস্ব বাড়ি সমেত কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ঋণ রাখিয়া যান নাই; ইহা হইতে তাঁহার পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ অনুমান করা যায়।

বিদ্যাসাগর-চরিত্রে সক্রিয় সহৃদয়তা

"আমার জীবন" নামক আত্মজীবনচরিতে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার প্রথম বিদ্যাসাগর-দর্শন সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? ···এই খর্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিত মস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধর ভঙ্গি, গগনোপম প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই বিদ্যাসাগর?" নবীনচন্দ্রের ভৃত্যও অন্য উপলক্ষ্যে বিদ্যাসাগরকে দেখিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন যে, অমন কদাকার পুরুষ

কখনও বিদ্যাসাগর হইতে পারেন না। জনৈকা বৃদ্ধার আক্ষেপের কথা বিদ্যাসাগর নিজেই গল্প করিতেন— হুগলী জেলার কোনও গ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়াছেন, বৃদ্ধাটি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আ আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর গায়ে উড়ে চেহারা দেখবার জন্যে রোদে ভাজাভাজা হলুম! না আছে গাড়ি, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগাচাপকান!"

এই কুৎসিত বহিরাবরণ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল অন্তরের বিশালত্ব। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মূল সূত্র মানতো, পরার্থপরতা, সক্রিয় সহৃদয়তা। "আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলাদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ", সকল জীবের অন্তরের দুঃখ যেন অন্তরে বসিয়া অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে তাহাদের দুঃখ দূর হয়, "কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্" দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখ দূর করিতে চাই— ইহাই বিদ্যাসাগরের মর্মবাণী। বুকে বুক লাগাইয়া তিনি অপরের ব্যথা নিজে টানিয়া লইতেন। কে শোকে রোদন করিতেছে? বিদ্যাসাগর দেখিয়া রোদন করিতে বসিলেন। কে রোগে ক্লিষ্ট? বিদ্যাসাগর তাহার সেবায় মগ্ন। মুটে, কলেরা হইয়াছে, পথে পড়িয়া আছেন— তাহাকে নিজের বাড়িতে আনিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কলেরারোগগ্রস্ত ভৃত্যকে প্রভু বাড়ির বাহির করিয়া দিয়াছেন— ভৃত্য আশ্রয় পাইলেন বিদ্যাসাগরের গৃহে; রোগসংক্রমণের ভয়ে রোগীর নিকট হইতে নিকট আত্মীয়ও সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—সেবা করিলেন বিদ্যাসাগর। নিজ ব্যয়ে চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন। নিজে হোমিওপ্যাথি শিখিয়া পয়সা না লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কেহ অর্থের অভাবে ক্লেশ পাইতেছেন, স্বজন বন্ধু সকলে বিমুখ, আগাইয়া আসিলেন বিদ্যাসাগর, প্রয়োজন হইলে ধার করিয়াও সাহায্য করিলেন। আমিষভোজনে জীবহত্যা হয়, নিরামিষ আহার ধরিলেন, দুগ্ধ পান করিলে গোবৎস বঞ্চিত হয়, তাই দুগ্ধ বর্জন করিলেন— কেবল মাতার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুনরায় আমিষ গ্রহণে বাধ্য হইলেন। মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায় হিসাবে জ্ঞানবিস্তারের প্রয়োজন— নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, ছেলেদের জন্য ও মেয়েদের জন্য সাধারণ দিবা-বিদ্যালয়, কৃষক ও রাখাল বালকদিগের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়, সকলের উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ। অন্য অনেক সহৃদয় মানুষের সহিত বিদ্যাসাগরের পার্থক্য এইখানে—

তাঁহারা অপরের দুঃখ দেখিয়া দুঃখবোধ করেন, সহানুভূতি দেখান, তাহার পরে খাইয়া শুইয়া পড়েন ও ভুলিয়া যান, তাঁহাদের সহানুভূতি নিষ্ক্রিয় ; বিদ্যাসাগর সেস্থলে একপ্রকার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নিজের সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করিয়া ব্যবস্থা করেন, তাঁহার সহানুভূতি সক্রিয়।

বিদ্যাসাগরের কর্মময়তা

বিদ্যাসাগরের জীবন কর্মময়। বিভিন্ন কর্মে তাঁহার চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অল্পদিন হইল বিদ্যাসাগর সরকারি চাকরিতে ঢুকিয়াছেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের সেরেস্তাদারের কাজ করিতেছেন। হরনাথ তর্কভূষণ ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যুতে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছে, প্রথম পদটির বেতন মাসিক নব্বই টাকা। কর্তৃপক্ষ বিদ্যাসাগরকেই ঐ পদটি দিতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে পদটি দিবার জন্য, তিনি তারানাথের কর্ম করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারানাথ কলিকাতা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে কালনায় রহিয়াছেন, এবং ঐ পদ গ্রহণ করিবেন কি না তাহাও জানা নাই ; সময় অল্প, চিঠি লিখিয়া যথাসময়ে খবর পাওয়া যাইবে না ; বিদ্যাসাগর নিজে হাঁটিয়া চলিলেন ত্রিশ মাইল পথ, এবং তারানাথের আবেদনপত্র ও প্রশংসাপত্র সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে ফিরিয়া আসিলেন।

এই ঘটনায় একদিকে দেখা যায় বিদ্যাসাগরের হাঁটিবার ক্ষমতা, দৈহিক শক্তি। তিনি মাইলের পরে মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন, কর্মস্থল কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেন বাহান্ন মাইল পথ হাঁটিয়া, একবার মাতার অনুরোধে ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষ্যে দেশে যাইতে দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। তিনি দৈহিক ব্যায়াম করিতেন, কপাটি খেলিতে ভালোবাসিতেন, কোনও অলস খেলা খেলিতেন না। শরীরের যন্ত্রণাতে তিনি নির্বিকার থাকিতে পারিতেন— লালবিহারী মিত্রের ডিস্‌পেন্‌সারিতে বই দেখিবার সময়ে একটি ভারি লোহার যন্ত্র পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর পড়িল, তিনি অম্লান-

বদনে বই দেখিয়া বাড়ি ফিরিলেন, পরে মাসাবধি শয্যাশায়ী রহিলেন, অন্য এক সময়ে ডাক্তার তাঁহার শরীরে একটি কার্‌বাঙ্কল্ কাটিয়া বাঁধিয়া দিলেন, বিদ্যাসাগর সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত কোনও সালিসি ব্যাপারে আলাপ করিয়া চলিলেন, কেহ বুঝিতেও পারিল না যে তাঁহারই দেহে অত বড়ো অস্ত্রোপচার হইয়া গেল।

তারানাথের ব্যাপারে অপর পক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে বিদ্যাসাগরের মানসিক বিশালত্ব। বিদ্যাসাগর এ-সময়ে একুশ-বাইশ বৎসর বয়সের যুবক, নূতন চাকরিতে ঢুকিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেছেন, তাঁহার পক্ষে নব্বই টাকা মাসিক বেতনের চাকরি অযাচিতভাবে হাতের কাছে পাইলে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিদ্যাসাগর তারানাথের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বড়ো মনে করিলেন, তারানাথের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে ধরিলেন, টাকা তুচ্ছবোধ করিলেন। যেখানে মনুষ্যত্বের প্রশ্ন, সেখানে বিদ্যাসাগরের নিকট টাকা মাটি, মাটি টাকা।

বিদ্যাসাগরের নিকট টাকা মাটি, মাটি টাকা। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্মচারি-ছাত্র Robert Cost (রর্বাট কস্‌ট্) অনুরোধ জানাইলেন, প্রধান পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁহার নামে সংস্কৃত ভাষায় একটি শ্লোক রচনা করিয়া দিন। এই অনুরোধে বিদ্যাসাগর দুটি শ্লোক রচনা করিয়া দিলে কস্‌ট্ তাঁহাকে দুই শত টাকা পুরস্কার দিতে চাহিলেন। এ-সময়ে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা বেতনের মধ্যে কুড়ি টাকা পিতার নিকট দেশে পাঠাইয়া বাকি ত্রিশ টাকায় কলিকাতায় নয় জনের সংসার চালাইতেন। তথাপি তিনি টাকাটা নিজে না লইয়া উহা দ্বারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের পারিতোষিক দানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কয়েক বৎসর পরের ঘটনা। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটরির পদে ইস্তফা দিয়া বসিয়া আছেন। এই সময়ে Education Council-এর (এডুকেশন্ কাউন্‌সিলের) অধ্যক্ষ Dr. Mouat-এর (ড. ময়েটের) অনুরোধে Captain Bank (ক্যাপ্‌টন্ ব্যাঙ্ক্) নামক ইংরাজকে কয়েক মাস সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী শিখাইলেন ; ব্যাঙ্ক পারিশ্রমিক দিতে আসিলে বিদ্যাসাগর প্রত্যাখ্যান করিলেন— ময়েটের অনুরোধে তিনি বন্ধু হিসাবে শিখাইয়াছেন, চাকরি হিসাবে তো নহে ! বারান্তরে, সরকারের প্রাপ্যবোধে স্বেচ্ছায় প্রায় পাঁচ হাজার

টাকা দিয়া দিলেন— সরকারও জানিতেন না যে ঐ টাকা তাঁহাদের প্রাপ্য। অপর ঘটনা কয়েক বৎসর পরের। বিদ্যাসাগর ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বিধবাবিবাহ, দান, প্রভৃতি ব্যাপারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ, কয়েক বৎসর পূর্বেই শেষবারের মতো সরকারি কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন— এই দুর্দিনে বন্ধু প্যারীচরণ সরকার ও কালীকৃষ্ণ মিত্র বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতে সংবাদপত্রে জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইলেন ; জানিতে পারিয়াই বিদ্যাসাগর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবাদ জানাইলেন, "হে বন্ধুগণ, তোমরা আমায় রক্ষা করো, আমি কাহারও সাহায্য লইব না।" টাকার লোভ বিদ্যাসাগরকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিস্টারি পড়িতে গিয়া ফ্রান্সে আর্থিক সংকটে পড়িয়াছেন ; দেশের জমিদারির আয় হইতে যে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থা মতো টাকা পাঠানো হইতেছিল না ; বন্ধুবান্ধবের কাহারও নিকট টাকা না পাইয়া অবশেষে তিনি অগতির গতি বিদ্যাসাগরের নিকট পত্র লিখিলেন। বিদ্যাসাগর তখন নিজেই বিপন্ন ; সরকারি চাকরি নাই, বিধবাবিবাহ ব্যাপারে ঋণগ্রস্ত। তথাপি এ-আবেদনে সাড়া না দিয়া পারিলেন না ; নিজের ঋণ বাড়াইয়া পনের শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকা প্রাপ্তি স্বীকার উপলক্ষ্যে মাইকেল লিখিলেন যে, তিনি নাকি তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother," যাঁহার নিকট আবেদন জানাইয়াছি তিনি জ্ঞান প্রতিভায় ঋষিকল্প, উদ্যমে ইংরাজ, হৃদয়ে বাঙালি মা। মাইকেল স্ত্রীর নিকট বলিয়া থাকুন, বা, না, কথাগুলি বিদ্যাসাগরের নিপুণ চিত্র। মধুসূদনকে আরও অনেক টাকা পাঠাইতে হয়। এবং ফলে, ঋণ শোধ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেসের নিজ স্বত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ। দেশ হইতে খবর পাইয়া বিদ্যাসাগর সরকারকে জানাইয়া স্থানে স্থানে সরকারি অন্নসত্র খুলিবার ব্যবস্থা

করিলেন, নিজের দেশের বাড়িতে নিজ ব্যয়ে অন্নসত্র খুলিলেন, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সহায়তা লইতে লজ্জাবোধ করিতেন, তাঁহাদিগকে গোপনে সাহায্য করিতে লাগিলেন, সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে নিজে বগলে কাপড়ের মোট লইয়া গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইয়া দিয়া আসিলেন। নীচ জাতীয় বলিয়া অভিহিত অনাথ স্ত্রীলোকদিগের রুক্ষ মাথায় নিজ হাতে তেল মাখাইয়া দিলেন। লোকে এতদিন জানিত যে, বিদ্যাসাগর বিদ্বান্, বিদ্যাশিক্ষাদানে উদ্যোগী, বিধবাবিবাহে পাণ্ডা ; লোকে এখন চিনিল, বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর।

ছাত্রজীবন হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের দানপ্রবৃত্তি ছিল— পিতা দরিদ্র, নিজেই সময়ে সময়ে পেট ভরিয়া খাইতে পান না, অথচ বৃত্তির টাকা দিয়া সহাধ্যায়ীদের সাহায্য করিতেছেন, নিজে চরকা-কাটা মোটা কাপড় পরিয়া অপর বালকদিগের ভালো কাপড় কিনিয়া দিতেছেন। সরকারি চাকরি হইতে আয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবৃত্তির প্রকাশ আরও বাড়িয়া গেল। নিজের অশনবসনে সর্বপ্রকারে মিতব্যয়ী রহিয়া গেলেন— মোটা ধুতি, মোটা চাদর ও চটি জুতা, এই বেশ, সাধ্যপক্ষে গাড়ি কি পালকি ব্যবহার করিতেন না, হাঁটিয়া যাইতেন, মোড়কের কাগজ ও দড়ি রাখিয়া দিতেন, লেখা কাগজের সাদা অংশটুকু কাটিয়া রাখিয়া দিতেন, শিলের হলুদবাটা জল ফেলিয়া না দিয়া তরকারিতে দিতে বলিতেন। অপর দিকে, দানের উপযুক্ত পাত্রকে দান করিতেন ধনীর মতো, দুঃস্থ সাহায্য চাইলেই পাইত, দুঃস্থ দেখিলে না চাহিতেও দিতেন। পিতা ঠাকুরদাস কৈশোরে সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া মুড়িওয়ালীর দোকানের সামনে সতৃষ্ণ নয়নে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছেন, পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র সমাজের উপর প্রতিশোধ লইয়াছেন নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া।

বিদ্যাসাগরের দানে ভেদবুদ্ধি ছিল না। বেশ্যা দাঁড়াইয়া আছেন উপার্জনের আশায়, বিদ্যাসাগর লক্ষ করিয়া তাঁহার হাতে টাকা দিয়া চলিয়া গেলেন। বায়ু-পরিবর্তন উপলক্ষ্যে বর্ধমানে রহিয়াছেন— চতুর্দিকের দরিদ্র মুসলমানদের কাপড় টাকা দিতেছেন, রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন, নিজগৃহে বিনা পয়সার ঔষধালয় খুলিয়াছেন। নির্জনে বাস করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বঙ্গভূমি ছাড়িয়া বিহারের কার্মাটার নামক অঞ্চলে বাড়ি করিয়া রহিয়াছেন— সেখানকার

সাঁওতালদের মধ্যে অর্থ বিলাইতেছেন, সাঁওতালরা বিদ্যাসাগরকে তাঁহাদেরই একজন পরমাত্মীয় বলিয়া জানেন।

বিদ্যাসাগর কখনও নামের জন্য দান করেন নাই, দেখাইয়া দান করেন নাই, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ গোপনীয়তা অবলম্বন করিয়া দান করিয়াছেন। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছেন শুনিয়া বলিলেন, দানের ও সাহায্যের বিষয়গুলি বাদ দিয়া দিও। এ-বিষয়ে তাঁহার নীতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণের আদর্শ, "ন দত্ত্বা পরিকীর্তয়েৎ", দান করিয়া বলিয়া বেড়াইও না, যিশুখৃষ্টের নীতি, "Let not thy left hand know what thy right hand doeth", ডান হাত দিয়া যা করো, তা যেন তোমার বাঁ হাতও জানিতে না পারে।

নামের আকাঙ্ক্ষা ছিল না বলিয়াই নামের আশায় বিদ্যাসাগর অপাত্রে দান করেন নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে পীড়িত পিতাকে দেখিবার জন্য কাশী গিয়াছেন। তখন তাঁহার ভারতবর্ষব্যাপী নাম, ঠাকুরদাস পরিচিত পুত্রের নামে। কাশীস্থ দলপতি ব্রাহ্মণগণ আসিলেন বিদ্যাসাগরের নিকট মোটা দানের প্রত্যাশায়— ইহলোকের যশের দুয়ারের চাবি তাঁহাদের কাছে, পরলোকের স্বর্গকক্ষের চাবি তাঁহাদের কাছে। বিদ্যাসাগর ইঁহাদিগকে নিরাশ করিলেন, এই নিষ্কর্মা ধর্মভিক্ষুদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই, তিনি কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না। তাঁহার দেবতা মাতাপিতা।

কাশীর ব্রাহ্মণদের মুখের উপর যে অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া দিলেন, সেই স্পষ্টবাদিতা তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের অন্যতম লক্ষণ। জনৈক ধনী নিজ শ্যালককে দরিদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া বিদ্যাসাগরের মেট্রপলিটান্ ইন্‌স্টিটিউশন্ নামক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক ছাত্র রূপে ভর্তি করিয়া দেন; বিদ্যাসাগর জানিতে পারিয়া ধনীটির মুখের উপর বলিলেন, "বঞ্চনা! ধিক্ তোমাকে!" সম্ভবত অন্যায় আবদারের বা ছলনার প্রতি ঘৃণা বশতই তিনি পিতামহী প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থগাছটি সম্বন্ধে অত জিদ দেখাইলেন। বিদ্যাসাগরের অন্নে পুষ্ট এক ব্যক্তি ও তাঁহার স্ত্রীপরিবারবর্গ যখন ঐ অশ্বত্থগাছটি নষ্ট করিয়া জায়গা দখল করিবার উদ্দেশ্যে নানা উৎপীড়ন করিয়া অবশেষে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মকদ্দমা রুজু করিলেন, এবং পূর্বোক্ত ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র যখন

উত্ত্যক্তবোধ করিয়া একাই সামান্য গাছের জন্য এত হাঙ্গামায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন বিদ্যাসাগর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই সর্! আমি নিজে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া গাছ রক্ষা করিব।"

বিদ্যাসাগর দাতা, কিন্তু নিজের ওজন ভোলেন নাই। নিজে উলঙ্গ হইয়া অথবা পরিবার ও আশ্রিতবর্গকে অনাহারে রাখিয়া দান করেন নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্যদিগেরও ঐ আদর্শ—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্মপ্রতিরূপক॥

(মানবধর্মশাস্ত্র ১১।৯)

পরিবারকে দুঃখে রাখিয়া অপরকে দান অধর্মমাত্র। সেইজন্য অমিতাচারী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিজে ঋণ করিয়াও আর্থিক সাহায্য করিয়া, তাঁহার ব্যারিস্টারি করার পথে অন্তরায় দূর করিয়া দিয়া, অবশেষে লিখিলেন, "your case is an utterly hopeless one. No exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you", আপনার একেবারেই আশা নাই, আমি যত চেষ্টাই করি, কিংবা ধনী নন এরূপ যে কেহই যত চেষ্টাই করুন, আপনাকে বাঁচানো যাইবে না।

বিদ্যাসাগর অসহায়ের সহায়। বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় হাঁটিয়া আসিতেছেন, পথে দেখিলেন একটি বৃদ্ধের মাথায় মোট, বৃদ্ধ চলিতে আর পারেন না। বিদ্যাসাগর সেই মোট বহিয়া দুই তিন ক্রোশ দূরে বৃদ্ধের বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। এক নিঃসন্তান বিধবাকে লড়িতে হইবে স্বামিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে reversiones-এর অর্থাৎ স্থায়ী ভবিষ্যত্তত্তরাধিকারীর বিরুদ্ধে; বিদ্যাসাগর তাহার পক্ষ হইয়া লড়িলেন। অত্যুৎসাহী সরকারি কর্মচারী অন্যায়ভাবে ব্যবসায়ীদের আয়কর ধরিয়াছেন; যুদ্ধ করিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যালয় পরিদর্শক-রূপে পরিভ্রমণ কালে হয়তো পথে কাহাকেও দেখিলেন রুগ্ন, চলিতে অক্ষম— নিজে পালকি হইতে নামিয়া রুগ্ন ব্যক্তিকে ঐ পালকিতে চড়াইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন। বর্ধমানে দরিদ্র মুসলমানেরা ম্যালেরিয়া রোগে পীড়িত; সরকারকে জানাইয়া প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিলেন বিদ্যাসাগর, কার্মাটারে সাঁওতাল মেথরানীর কলেরা হইয়াছে,

ঔষধের বাক্স বগলে লইয়া ছুটিলেন বিদ্যাসাগর। পরবর্তীকালে নামকরা অনেক ব্যক্তিও বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণী— কৃষ্ণদাস পাল, সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া ঐ নামে সুপরিচিত হন), কবি নবীনচন্দ্র সেন তন্মধ্যে অন্যতম।

বিদ্যাসাগরের মনের দরদ বোধহয় সবচেয়ে ফুটিয়াছে একটি তুচ্ছ ব্যাপারে। বন্ধু কালীকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী কুন্তীবালা। বিদ্যাসাগর নিজে ঘটকালি করিয়া কুন্তীবালার বিবাহ দিলেন কালীচরণ ঘোষের সহিত। বিবাহের কিছু পরে একটি পুত্র অকালে হারাইয়া কুন্তীবালা উন্মাদ হইয়া গেলেন, এবং একদা জেদ ধরিলেন যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না। তাই, শতকর্মব্যস্ত দেশবরেণ্য, বিদ্যাসাগর একটি উন্মাদিনীকে নিজ হাতে খাওয়াইতে দু'বেলা ছুটিতেন কয়েকমাস ধরিয়া।

ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরের জাতিভেদ বোধ ছিল না। শুধু যে তিনি কায়স্থ অমৃতলাল মিত্রের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া মাছের মুড়া খাইয়াছিলেন, বা, সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবেশাধিকার করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা নহে। অর্থের ব্যবধানে যে জাতির ব্যবধান সৃষ্টি হয়, সেই দৃঢ়তর ব্যবধানও তিনি মানেন নাই। পাইকপাড়া রাজাদের বাড়িতে যাইতে যাইতে ডাক শুনিলেন, "ঈশ্বর, ভালো আছ?" দেখিলেন, রামধন নামে পূর্বপরিচিত জনৈক মুদি। অমনি মুদির দোকানের সামনের চটের উপরে বসিয়া মুদির থেলো হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে "রামধন খুড়ো" বলিয়া আলাপ জুড়িয়া দিলেন। আম কিনিতে যাইয়া দোকানে বসিয়া আমওয়ালার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করিলেন। তাঁহার এই আচরণ দেখিয়া পরিচিত সম্ভ্রান্ত মানুষেরা লজ্জা পাইতেন। কেহ অনুযোগ করিলে বিদ্যাসাগর বলিতেন, "আমার সহিত সম্পর্ক না রাখিলেই লেঠা চুকিয়া যায়।" দীন দরিদ্র সরল লোকের সহিত কথা বলিতেই তিনি ভালোবাসিতেন।

বালকস্বভাব বিদ্যাসাগর সরল লোকের সহিত মিশিতে ভালোবাসিতেন। কবিগান শুনিতে ভালোবাসিতেন, কৌতুক করিতে ভালোবাসিতেন। অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ছাত্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অধ্যাপকের বিশেষ পীড়াপীড়িতে ঈশ্বরচন্দ্র সরস্বতীর বর্ণনা করিয়া শ্লোক রচনা করিলেন—

লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্,
যস্যা এ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্—

যে সরস্বতীর প্রসাদে লুচি, কচুরি, মতিচুর, জিলেপি, সন্দেশ ও গজার ফলার পাই, সেই সরস্বতীর চিরকাল জয় হোক। চৌদ্দ পনের বছর বয়সে বিবাহ দিলেন পিতা ; বাসর ঘরে অন্যান্য বালিকাদের সঙ্গে মেশানো বধূকে বর খুঁজিয়া বাহির করিবে ; একনজর দেখা বালিকা-বধূকে চেনা প্রায় অসম্ভব ; ঈশ্বরচন্দ্র পছন্দমতো একটি বালিকাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই আমার বউ!" যাঁহারা রসিকতা করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পাল্টা রসিকতার চাপে চ্যাপ্টা হইয়া গেলেন। লোককে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইতেও তিনি ভালোবাসিতেন, আর গল্প করিতে করিতে বলিতেন—

হুঁ হুঁ দেয়ং, হাঁ হাঁ দেয়ং, দেয়ঞ্চকরকম্পনে,
শিরসি চালনে দেয়ং, ন দেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে—

হুঁ হুঁ, হাঁ হাঁ, করিয়া অসম্মতি জানাইলে ভোজ্য দিতে হইবে, হাত নাড়িয়া বা মাথা নাড়িয়া বারণ করিলেও দিতে হইবে, তবে, বাঘের মতো লাফাইয়া উঠিলে দেওয়া চলিবে না। নিজের পুত্র নারায়ণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানকে পিতা ঠাকুরদাস বিশেষ আদর করেন লক্ষ করিয়া বিদ্যাসাগর রসিকতা করিয়া পিতাকে বলিলেন, "আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, অথচ লোককে বলেন যে আপনি নিরামিষাশী!" বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ঘরে বিদ্যাসাগর বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কয়েকজন বসিয়া আছেন ; এক ব্যক্তি বিচারপতি দ্বারকানাথকে দেখিবার আশায় বাহির হইতে জানালা দিয়া উঁকি মারিতেছিলেন ; বিদ্যাসাগর লক্ষ করিয়া লোকটির উঁকি মারার কারণ জানিয়া বলিলেন, "তাঁর আর কি? ইনি কৃষ্ণদাস পাল ; এঁর চেয়ে যিনি সুন্দর, তিনিই জজ দ্বারিক মিত্তির। বলো দেখি কে?" সুপুরুষ বলিতে ঘরে কেহই না থাকায়, সকলের হাসির মধ্যে লোকটি পলাইলেন। শেষ জীবনে, মানবচরিত্র সম্বন্ধে কঠোর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিক্ত রসিকতা ছাড়েন নাই—কেহ তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন শুনিয়া বলিতেন, "সে আমার নিন্দা

করিবে কেন, আমি তো তাঁর কোনো উপকার করি নাই !"

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ছিল সরলতার পাশাপাশি কঠোরতা। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ; কোথাও বিশেষ কাজে গিয়া বেলা হইয়া গিয়াছে; নিজের বাড়ি গিয়া খাওয়াদাওয়া করিতে গেলে কলেজে পৌঁছিতে দেরি হইবে, তাই, পথে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্নের ছাত্রাবাসে ঢুকিয়া একখানি ভিজে কাপড় পরিয়া কুয়া হইতে জল তুলিয়া স্নান করিলেন। বালকেরা আহারে বসিয়াছিল, তাহাদের পাত হইতে এক এক থাবা ভাত লইয়া খাইয়া সকলের আগে উঠিলেন, গল্প হাসি তামাসা করিয়া যথাসময়ে কলেজে গেলেন; কলেজে গিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি— কঠোর, কর্তব্যপরায়ণ, গম্ভীর— তারাকুমার অবাক্ হইয়া গেলেন। এই তারাকুমারের প্রতি কোনও সময়ে কিছু অবিচার করিয়া, পরে ভুল বুঝিতে পারিয়া, দীনভাবে তিনি ক্ষমা চাহিলেন। বিদ্যাসাগর লোকোত্তরচরিত, যাঁহারা বজ্রাদপি কঠোরাণি, মৃদূনি কুসুমাদপি, বজ্র অপেক্ষা কঠোর, কুসুম অপেক্ষা কোমল। তিনি হাস্যময়, কর্তব্যময়, কর্মময়।

বিদ্যাসাগর ও ধর্ম

বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবনে ধর্মক্রিয়ার স্থান ছিল না, ধর্মক্রিয়া বলিতে আমরা সাধারণত যে ঈশ্বরের পূজা, আরাধনা, উপাসনা, জপ, ধ্যান বুঝি, হিন্দু বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াও তিনি বাল্যকাল হইতেই সাধারণ হিন্দুর আরাধ্য দেব-দেবীর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাহীন। শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সরস্বতী সম্পর্কে সংস্কৃতে শ্লোক লিখিতে; ঈশ্বরচন্দ্র ফাঁপরে পড়িলেন, যে দেবীতে বিশ্বাস শ্রদ্ধা নাই, সে-সম্বন্ধে কি লিখিবেন? অবশেষে এড়াইতে না পারিয়া লিখিলেন পূর্বে উল্লিখিত blasphemous ভক্তিশ্রদ্ধারহিত পংক্তি চতুষ্টয়, "লুচি কচুরি মতিচুর শোভিতং" ইত্যাদি। দেশের বাড়িতে দুর্গোৎসব করিতে বৎসরে ছয় সাত শত টাকা ব্যয় হয়, অথচ, ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে দেশের অনেক দরিদ্র অর্ধাহারে দিন কাটাইতেছে; দুর্গা তো কই দুর্গতিনাশিনী নয়! তাই, মাতার অনুমতি লইয়া বিদ্যাসাগর দুর্গার পূজার পরিবর্তে দুর্গতের পূজা, দুঃস্থের পূজা করা মনঃস্থ করিলেন।

যেমন দেব দেবীর পূজা করেন নাই, তেমনি একেশ্বরের পূজাও করেন নাই বিদ্যাসাগর। পূজা, আরাধনা, উপাসনা, ধ্যান— এসবের কিছুই বিদ্যাসাগরের জীবনে ছিল না। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতক ধরিয়া ধর্মধ্বজীদের চীৎকারে ভারতবর্ষের গগন ফাটিবার উপক্রম; একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারিরা খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য অক্লান্তভাবে মুখ ও কলম চালাইতেছিলেন; অপরদিকে, প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, রামমোহন রায় আনিলেন এক ব্রহ্মের ভজনা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁহার অনুচর-বর্গ ঐ ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকার্যে ব্রতী হইলেন মিশনারিদের অনুকরণে, দয়ানন্দস্বামী প্রতিষ্ঠা করিলেন আর্যসমাজ প্রাচীন বৈদিক ভিত্তিতে, শশধর তর্কচূড়ামণি বক্তৃতা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিলেন যে, হিন্দুধর্ম আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। এই ধর্মকোলাহল বিদ্যাসাগরের জন্মের পূর্ব হইতে শুরু হইয়া তাঁহার মৃত্যুর পরেও চলিয়াছিল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ও নির্লিপ্ত থাকিতেন। কেহ তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "ধর্ম যে কি, তাহা বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত, জানিবার দরকারও নাই," "এ দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, তা বেশ বুঝি, তবে, ঐ পথে না চলিয়া এ-পথে চলিলে নিশ্চয় তাঁহার প্রিয়-পাত্র হইব, স্বর্গরাজ্য অধিকার করিব, এ সকল বুঝিও না, বুঝাইবার চেষ্টাও করিও না।"

ঈশ্বরকে করুণাময় বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা যে ভ্রান্ত, একথা বিদ্যাসাগর দৃঢ়ভাবে মনে করিতেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে কত লোক কষ্ট পাইল, কত লোক মরিল, ঈশ্বর কি দেখিলেন না? ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Sir John Lawrence (সার্ জন্ লরেন্স্) নামক জাহাজ বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে ডুবিল, বহু পুরীতীর্থযাত্রী প্রাণ হারাইলেন; বিদ্যাসাগর সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর? দুনিয়ার মালিকের কি এই কাজ!" বিদ্যাসাগর ভাবিতেন, যখন মানবজীবনে দানবশক্তির একচ্ছত্রাধিপত্য, তখন ঈশ্বরের পূজার অবকাশ কোথায়? শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে একদিন স্পষ্টই বলিলেন, "জঙ্গীশ্ খাঁর হুকুমে এক লক্ষ বন্দীকে কাটিয়া ফেলা হইল; এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঈশ্বর দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না; সুতরাং ঈশ্বরকে ডাকার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগরের উইলে মানুষসেবার জন্য টাকার বরাদ্দ আছে, কিন্তু দেবসেবার জন্য বা ধর্মপ্রতিষ্ঠানের জন্য কিছুই নাই।

বিদ্যাসাগরের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনার অভাব ও কর্মময়তার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন যে, বিদ্যাসাগরের অন্তর্দৃষ্টি নাই, অন্তরে ঈশ্বরের দর্শন হইলে বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া ঈশ্বর লইয়াই থাকিতেন।

"বিদ্যাসাগর" উপাধিধারী একাধিক ব্যক্তি থাকিলেও যেমন "বিদ্যাসাগর" বলিতে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বোঝা যায়, তেমনি "পরমহংস" বলিয়া পরিচিত বহু সন্ন্যাসী থাকিলেও বঙ্গভূমিতে "পরমহংস" বলিতে রামকৃষ্ণকে বোঝা যায়। রামকৃষ্ণের পুরা নাম রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ডাক নাম গদাধর।

রামকৃষ্ণের জন্ম— ১৮৩৬ (?) খ্রীষ্টাব্দ ১২৪২ (?) বঙ্গাব্দ। বিদ্যাসাগরের জন্মের প্রায় ষোল বৎসর পরে, বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামের কয়েক মাইল উত্তরে, ঐ হুগলী জেলারই অন্তঃপাতী কামারপুকুর নামক গ্রামে রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার রামভক্ত ও একসময়ে ধনাঢ্য ছিলেন। ইঁহাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন রঘুবীর বা রাম এবং পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তির নামের সহিত "রাম" শব্দটি যুক্ত থাকিত— পিতামহ মাণিকরাম, পিতা ক্ষুদিরাম, পিতৃব্য নিধিরাম ও রামকানাই, পিতৃষ্বসা রামশীলা, ভ্রাতা রামকুমার ও রামেশ্বর, ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল, আলোচ্য পুরুষ রামকৃষ্ণ। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেরূপ হয়, এই পরিবারেও সেইরূপ অত্যধিক অনুভূতিপ্রবণতা চরিত্রগত লক্ষণ ছিল। পিতা ক্ষুদিরাম ফুল তুলিতে গিয়া যেন দেখিতেন যে, শীতলাদেবী অর্থাৎ বসন্তব্যাধির দেবতা মানুষীর বেশে ফুল তোলার কাজে সাহায্য করিতেছেন ; পিতৃষ্বসা রামশীলার উপরেও কখনও কখনও ঐ শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। যোগাযোগ বশে, রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রমণিও এই চরিত্রের ছিলেন ; তাঁহার অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন, শ্রবণ ও অনুভূতি হইত— একদিন যেন লক্ষ্মীদেবী দেখা দিয়া একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন, কোনও দিন বা দেখিলেন যে, মশারির মধ্যে শিশুপুত্রের পরিবর্তে দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ, কখনও বা দেখিলেন যে, হাঁসের পিঠে চড়িয়া এক দেবতা আসিয়া উপস্থিত। এই ভাবময় পরিবারে, ভাবাকুল পিতার ও মাতার শরীর হইতে জন্ম-

গ্রহণ করিয়া ভাবময় হওয়া বিচিত্র নয়। রামকৃষ্ণের জীবনের ইতিহাস ভাবাবেশের ইতিহাস।

রামকৃষ্ণের প্রথম ভাবাবেশ হয় ছয় বৎসর বয়সের সময়ে। মাঠের আইল দিয়া মুড়ি খাইতে খাইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে আকাশে এক ঝাঁক সাদা বক কালো মেঘের কোল দিয়া উড়িয়া যাইতেছে লক্ষ করিলেন, এবং তন্ময় হইয়া দেখিতে দেখিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। ইহার সহিত ঐশ্বরিক চিন্তার কোনও সম্পর্ক নাই।

রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় ভাবাবেশ হয় সম্ভবত ঈশ্বরচিন্তায়, আট বৎসর বয়সে কয়েকজন গ্রামবাসী স্ত্রীলোকের সহিত নিকটস্থ বিশালাক্ষীর মন্দিরে যাইবার পর ভক্তিমূলক গান গাহিতে গাহিতে। তৃতীয়বার ভাবাবেশ হয় কৈশোরে, গ্রামের এক যাত্রায় শিবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কোনও কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া ভগবচ্চিন্তা বিশেষভাবে মনে আসিলেই ভাবাবেশ হইত। কলিকাতায় গড়ের মাঠে বেলুন ওঠা দেখিতে গিয়াছেন. একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে— দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভাবাবেশ হইল। মাইক্রস্কোপ দেখিতে বসিয়াছেন— অমনি ভাবাবেশ, মাইক্রস্কোপ দেখা মাথায় উঠিল। চিড়িয়াখানায় গিয়া সিংহ দেখিয়াই ভাবাবেশ এবং পত্রপাঠ ফিরিয়া আসা হইল। এই অত্যনুভূতিপ্রবণতা বাড়িতে বাড়িতে শেষজীবনে এমন হইল যে, কোনও ধাতুর জিনিসে হাত দিলে হাত কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ করিত, ধাতুনির্মিত বাটি, গাড়ু, টাকা-পয়সা প্রভৃতিতে হাত দিতে পারিতেন না।

এই জাতীয় অত্যনুভূতিপ্রবণতার কথা বঙ্গভূমিতে ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণের ভক্ত মনোমোহন মিত্রও রামকৃষ্ণের মতো আকাশে সাদা পাখি দেখিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের বাহিরেও এই ভাবাবিষ্টতার falling with ecstasy-র উদাহরণ আছে। চীনা হং চিউ সুয়েন্ এবং সুদানের অধিবাসী মহম্মদ আমেদের নাম এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই জাতীয় ভাবাবিষ্টতা স্নায়বিক কেন্দ্রের অস্বাভাবিক বা বিকৃত গঠনের ফল। এবং সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও সাময়িকভাবে স্নায়বিক বৈকল্য সম্ভব। একটি বিশেষ চিন্তা— সেটি ঈশ্বর-

বিষয়ক হউক বা অন্য কোনও বিষয়ক হউক— স্নায়বিক কেন্দ্রে গিয়া সজোরে আঘাত করিলে, মস্তিষ্কের কলগুলি সাময়িকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে ; হঠাৎ কোনও অতি-দুঃখের বা অতি-সুখের খবর শুনিয়া সাধারণ মানুষও চৈতন্য হারাইতে পারেন। যাঁহাদের স্নায়বিক কেন্দ্র অস্বাভাবিকরূপে অনুভূতিশীল, তাঁহাদের পক্ষে আবিষ্ট হইয়া পড়া আরও সহজ। যে নিজস্ব স্নায়ু মানুষকে পথ দেখায়, সেই নিজস্ব স্নায়ু মানুষকে বিপথেও চালিত করে।

রামকৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাস

রামকৃষ্ণ যে-সময়ে জন্মিয়াছিলেন, সে-সময়ে তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হইলেও চলিয়া যাইত। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার তখন গ্রামের চতুষ্পাঠীতে অধ্যায়ন শেষ করিয়া ব্যাকরণে, সাহিত্যে ও স্মৃতি-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া যাজনক্রিয়ার দ্বারা এবং স্মৃতির বিধান যথাকালে দিয়া অর্থোপায় করিতেছেন। রামকৃষ্ণ গ্রাম্য পাঠশালায় প্রেরিত হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ নিরক্ষর, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সতের বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। তাহার পরে কলিকাতায় আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের টোলেও কিছুদিন পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন। বর্তমানকালে স্কুল ফাইনাল পাস করিয়া হায়ার সেকণ্ডারিতে কিছুকাল পড়াশুনা করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকে যদি নিরক্ষর বলা সঙ্গত হয়, তবেই রামকৃষ্ণকেও নিরক্ষর বলা সঙ্গত। তবে, লেখাপড়ায় রামকৃষ্ণ সেরূপ ভালো ছাত্র ছিলেন না। তৎসত্ত্বেও, বেদ, বেদান্ত, দর্শন, পুরাণাদি বিষয়ে তাঁহার গুরুমুখী শিক্ষাও প্রচুর ছিল। এই গুরুমুখী শিক্ষাও বিদ্যালাভের অন্যতম প্রকৃষ্ট সোপান— প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে গুরুমুখী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা ছিল, গুরুমুখী শিক্ষালাভ করিয়াই কেহ কেহ দিগ্‌গজ পণ্ডিত হইতেন। ইহা ভিন্ন রামকৃষ্ণ বাল্যে গ্রামে ভাগবৎপাঠও সংকীর্তনাদি শুনিতেন। গ্রামের পাশ দিয়া পুরীতীর্থে যাইবার পথ ছিল, এবং বহু তীর্থযাত্রী সাধু সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে সাময়িকভাবে আস্তানা গাড়িতেন ; বালক রামকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট গিয়া বসিয়া থাকিতেন ও তাঁহাদের মুখের কথা শুনিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির যখন প্রথম

প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন গঙ্গাসাগর ও পুরীতীর্থ যাইবার পথে বহু সাধু ঐ স্থানে দুই-এক দিনের জন্য থাকিতেন ; ইঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ পণ্ডিত ছিলেন ; ইঁহাদের নিকট মুখে-মুখে শুনিয়া রামকৃষ্ণ অধিকাংশ শাস্ত্র-গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তির প্রখরতার ফলে তিনি সহজেই মুখে-মুখে শিখিতে পারিতেন। যাঁহাদের নিকট এইভাবে শিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সন্ন্যাসী-গুরু তোতাপুরী ও তন্ত্রসাধনায় গুরু ভৈরবী অন্যতম।

রামকৃষ্ণ যে শুধু বাংলাভাষা জানিতেন, তাহা নয়। পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিলে বুঝিতে পারিতেন— বাস্তবিক, সতর বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি তো সংস্কৃততেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন— তবে, নিজে সংস্কৃতে কথা বলিতে পারিতেন না। ইংরাজিও কিছু-কিছু জানিতেন, এবং বাংলায় কথা বলিতে বলিতে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন, —যেমন, বর্তমান যুগের শিক্ষিত যুবকেরা করিয়া থাকেন— উদাহরণস্বরূপ, dilente, under, refine, like, thank you, stick, beautiful, queen, building, philosophy, pension শব্দগুলি উল্লেখ করা চলে ; তবে, উচ্চারণ সব সময়ে ঠিক হইত না। যেমন, বর্তমান যুগের শিক্ষিত যুবকেরও হয় না, philosophy-র উচ্চারণ করিতেন ফেলাজফি, pension-র উচ্চারণ করিতেন পেন্‌শিল্।

শুনিয়া শুনিয়া যে কেবল শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা নয়, কথা বলিতে বলিতে যেসব উপমা দিতেন বা গল্প বলিতেন— যেগুলি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত বলিয়া সাধারণতঃ মনে করা হয়— সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি ঐভাবে অপরের নিকট হইতে জানা। ভিতরে পূর্ণজ্ঞান হইলে বাহিরের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ (যেমন, ত্রিসন্ধ্যা জপ, তিলক বা মালা ধারণ) থাকে না, এই কথা উপমা দিয়া বুঝাইবার জন্য রামকৃষ্ণ বলিতেন, "নারিকেলের বোল্লো খসিয়া যাওয়ার" কথা, এই উপমাটি তিনি জনৈক গোস্বামীর নিকট শুনিয়া শিখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলিতেন, "দশবার গীতা গীতা বল্লে যা' হয় ; তাই গীতার সার, অর্থাৎ, ত্যাগী", এই কথাটি তিনি তোতাপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। তিনি বিশেষভাবে ঋণী ভগবদ্ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের নিকট, তাঁহার একাধিক উপমা রামপ্রসাদ সেনের রচিত গান কাহারও কণ্ঠে শুনিয়া শেখা।

যে যাহা বলে তাহাই অভ্রান্ত সত্য বিবেচনা করিয়া মনে গাঁথিয়া

রাখিলে কিছু কিছু ভুল না হইয়া পারে না, সকল বক্তা সমান পণ্ডিত নন. তাই রামকৃষ্ণেরও ভুল শেখা হইয়াছিল। জনৈক ব্রাহ্ম প্রশ্ন তুলিলেন, "তিনিই যদি সব করাচ্ছেন, তাহ'লে আমি পাপের জন্যে দায়ী নই ?" উত্তরে, রামকৃষ্ণ বলিলেন, "দুর্যোধন ঐকথা বলেছিল, 'ত্বয়া, হৃষীকেশ, হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি, তথা করোমি'।" প্রকৃতপক্ষে, "ত্বয়া, হৃষীকেশ", ইত্যাদি উক্তি দুর্যোধন করেন নাই, মহাভারতে ঐ শ্লোকটি বা ঐ জাতীয় কোনও উক্তি দুর্যোধনের মুখে কিংবা কাহারও মুখেই নাই। শ্লোকটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের রচনা।

শিক্ষিত হইলেও রামকৃষ্ণের মুখের ভাষা কিছু অমার্জিত, সময়ে সময়ে শ্রুতিকটুও, মনে করা যায়। "আপনি কি বলো." "আপনারা বোসো", এইধরনের কথা তিনি সকল সময়েই বলিতেন, ভুল হইতেছে, বুঝিতেন না; নিজের স্ত্রী সারদা দেবীকে "আমার মাগ" বলিয়া সকলের সমক্ষে উল্লেখ করিতেন; শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত নাচিতেছেন না দেখিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, "য়্যাই শালা, নাচ" — সম্বন্ধ নির্বিশেষে, এমনকি পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিদেরও তিনি "শালা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন; একবার তাঁহার একজন ভক্তের বাড়িতে গাড়ি করিয়া গিয়া ভক্তকে উপস্থিত না পাইয়া বাড়ির মহিলাদের নিকট ভাড়া চাহিয়া পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন, "ওরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে ?"— "ভাতার" শব্দটি "ভর্তা" শব্দের অপভ্রংশ হইলেও শিক্ষিত বাঙালীর মুখে শব্দটি প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়।

বাল্যে রামকৃষ্ণ

গ্রামে বাল্যকাল কীভাবে কাটাইয়াছেন, সে কথা রামকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী জীবনে ভক্তদের নিকট বলিয়াছেন, "ও দেশে ছেলেবেলায় আমায় পুরুষ-মেয়ে সকলে ভালোবাসতো। আমার গান শুনতো। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখতো ও শুনতো। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্য খাবার জিনিস রেখে দিতো। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করতো না। সকলে দেখতো যেন বাড়ির ছেলে। কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভালো সংসার দেখলে সেখানে আনাগোনা করতুম, যে-বাড়িতে দুঃখবিপদ্ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। ... পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগতো। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে

পারতুম। সদাব্রত, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম ; গিয়ে অনেকক্ষণ ধোরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বোসে বোসে শুনতুম। তবে যদি ঢং কোরে পড়তো, তা'হলে তা'র নকল করতুম, আর অন্য লোকেদের শোনাতুম। মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত— শ্রীম কথিত, পঞ্চম ভাগ, পঞ্চম সং, পৃ ৫০-১)।

কলিকাতায় রামকৃষ্ণ

রামকৃষ্ণের বয়স যখন প্রায় সাত বৎসর, তখন পিতা ক্ষুদিরামের মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহাতে পরিবারের আর্থিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই, কারণ, পূর্ব হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার যাজনাদি ক্রিয়ায় অর্থোপার্জন করিয়া সংসার চালাইতেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে আয়ের হ্রাস হওয়ায় রামকুমার রাজধানী কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর অঞ্চলে টোল খুলিলেন। প্রায় তিন বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, রামকৃষ্ণের বয়স যখন ষোলো-সতর বৎসর, তখন রামকুমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে নিজের কাছে কলিকাতায় আনিলেন, উচ্চশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে এবং যাজনাদি ক্রিয়ায় সহায়তার আশায়। রামকৃষ্ণ কলিকাতায় আসিয়া টোলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, ও সেইসঙ্গে দেবসেবার কার্যে অগ্রজকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

রাসমণি নামে জনৈকা ধনাঢ্য বিধবা কলিকাতার চার-পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে ভাগীরথী নদীর কূলে একত্র কয়েকটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন—একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির, একটি কালীমন্দির, এবং বারোটি শিবমন্দির। ভবতারিণী নাম দিয়া এই কালীমূর্তিটির প্রতিষ্ঠাকরণ উপলক্ষ্যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১মে তারিখে রামকুমার পূজারীর কাজ করিতে মন্দিরে আসেন, এবং তদবধি ঝামাপুকুরের টোল উঠাইয়া দিয়া পূজারীরূপে মন্দিরসংলগ্ন পূজারীগৃহে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে রামকৃষ্ণও আসিয়া সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, এবং মন্দিরের প্রসাদান্নে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

রামকুমারের নিকটে রাসমণি বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন ; কারণ, রাসমণি কৈবর্ত শ্রেণীর শূদ্রজাতীয়া ছিলেন বলিয়া অন্য কোনও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণই তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তির পূজারীর পদ গ্রহণ করিতে সম্মত

হন নাই। সেইজন্য তিনি ও তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস, যিনি তাঁহার সম্পত্তির পরিচালনা করিতেন, চিরকাল রামকুমারের ও রামকৃষ্ণের সর্বপ্রকার সাংসারিক অভাব দূর করিতেন।

রামকৃষ্ণ অনর্থক বসিয়া খাইতেছেন, সম্ভবতঃ এই বিবেচনায় মথুরামোহন তাঁহাকে কালীমূর্তির বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। কয়েকদিন পরে, অসাবধানতার জন্য রাধাকৃষ্ণের পূজারীকে পদচ্যুত করা হয়, এবং তাঁহার স্থলে রামকৃষ্ণকে রাধাকৃষ্ণের পূজারী পদে নিযুক্ত করা হয়। কালীমূর্তি পূজা অধিক পরিশ্রমের কাজ, রাধাকৃষ্ণমূর্তিযুগল পূজা অল্প পরিশ্রমের কাজ, রামকুমার বার্ধক্যের ফলে আর শ্রমসাধ্য কাজ পারিয়া উঠিতেছিলেন না, এইজন্য রামকুমারের ইচ্ছায় মথুরামোহন শীঘ্রই পূজারীর পদ পরস্পরের মধ্যে বদল করিয়া দেন, রামকুমারকে রাধাকৃষ্ণমূর্তি পূজারী, রামকৃষ্ণকে কালীমূর্তি পূজারী করিয়া দেন। তখন রামকৃষ্ণের বয়স কুড়ি বৎসর। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে রামকুমারের মৃত্যু হয়।

কালীর পূজারী

রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালীবিগ্রহের পূজারী হওয়ার ঘটনাটি রামকৃষ্ণের জীবনের মোড় ফিরাইয়া দেয়। কালীপূজারীর পদ গ্রহণ করিয়া রামকৃষ্ণ যে কালীসাধনা আরম্ভ করিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের শেষপর্যন্ত মূল মন্ত্র রহিয়া গেল। কালীকেই ঈশ্বরের মুখ্যরূপ হিসাবে ভক্তি করিয়া ঈশ্বরভাবে তন্ময় হইয়া থাকা, ইহাই তাঁহার জীবনের সার হইল। ইহারপরেও অবশ্য মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ঈশ্বরসাধনা করিয়াছেন—কখনও হনুমানের মতো হইবার জন্য নিজ অঙ্গে কাপড়ের লেজ বাঁধিয়া, কখনও তন্ত্রোক্তভাবে জনৈকা ভৈরবীর নির্দেশ অনুসারে। কখনও সখীভাবে, কখনও অদ্বৈতভাবে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী তোতাপুরীর উপদেশ মতে, কখনও মুসলিমভাবে গোবিন্দ রায় নামক জনৈক মুসলমানের নিকট, কখনও খ্রীষ্টানভাবে—কিন্তু পরিশেষে তিনি সাকার কালীর নিকটই ফিরিয়া আসিয়াছেন, কালীসাধনাই তাঁহার চরম সাধনা।

এই সময়ের বিভিন্ন উপায়ে সাধনের কথা তিনি পরবর্তী কালে স্বীয় ভক্তগণের নিকট গল্প করিয়াছেন। বলিতেন, "গাছতলায় পোড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বোলে, চক্ষের জলে গা ভেসে যেতো", "মা,

মা, বোলে এমন কাঁদতুম, যে লোক দাঁড়িয়ে যেতো", "বোলতুম, মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না", "শিবলিঙ্গবোধে নিজের লিঙ্গ পূজা করতুম, জীবন্ত লিঙ্গ পূজা, একটা আবার মুক্তা পরানো হোতো", "দাসীভাবে এক বৎসর ছিলুম, ব্রহ্মময়ীর দাসী মেয়েদের কাপড় ওড়না এইসব পরতুম, আবার নথ পরতুম"।

ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতে থাকিতে রামকৃষ্ণ কিছুকালের জন্য বাহ্যত একরূপ উন্মাদ হইয়া যান। এই উন্মাদ-অবস্থা সম্পর্কে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন—

"আমার সেই উন্মাদ-অবস্থায় লোকজনকে ঠিক ঠিক হক কথা বোলে ফেলতুম। কারুকে মানতুম না। ·· একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলুম জয় মুখুয্যে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলুম। একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়িতে এসেছে, কালী ঘরে এলো ; পূজার সময় আসতো, আর, আমাকে দুই-একটা গান গাইতে বোলতো ; আমি গান গাচ্ছি, এমন সময় দেখি যে সে অন্যমনস্ক হোয়ে ফুল বাচ্ছে ; অমনি দুই চাপড়।"

চাপড় খাইয়াও রাসমণি রামকৃষ্ণকে তাড়ান নাই। কারণ, এই চট্টোপাধ্যায়-পরিবারই তাঁহার মুখ রক্ষা করিয়াছে, ইঁহাকে তাড়াইলে হয়তো আর কালীপূজারী পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু পূজারীর পদ হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার খুড়তোতো ভাই রামতারককে পূজারী নিযুক্ত করিলেন, এবং তাঁহার উন্মাদ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এই ঘটনার পর হইতে রামকৃষ্ণ আর কোনও দিন পূজারীর কাজ করেন নাই, কিন্তু পূজারীর নিবাসস্থানেই থাকিতেন, এবং রাসমণির জমিদারির আয় হইতেই তাঁহার অশন-বসনাদির ব্যবস্থা চলিত। তাঁহার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি তখন হইতে বসিয়া বসিয়া "পেন্‌শিল্ খাইতেন" ; মাত্র দুই-তিন বৎসর চাকরি করিয়া এই পেন্‌শন্ লাভ।

রামকৃষ্ণের বিবাহ

উন্মাদ হওয়ার কথা রামকৃষ্ণের জননী শুনিয়া তাঁহাকে দেশের বাড়িতে আনাইলেন, এবং ঔষধ হিসাবে বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণের বয়স তখন প্রায় তেইশ বৎসর। বিবাহের কথায়

তিনি নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং চার-পাঁচ মাইল পশ্চিমে জয়রামবাটি নামক গ্রামের সারদা নামের একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রামকৃষ্ণ বিবাহ করিলেন স্বেচ্ছায়, নিজের মনোমত পাত্রীকে, সুখে সংসার করিবেন এই আশায়। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে, একদিন শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত নিভৃতে আলাপ করিতে করিতে রামকৃষ্ণ এ-বিষয়ে তাঁহার অন্তরের কথা ব্যক্ত করেন। বলেন, "লোকে শ্বশুরবাড়ি যায়। এতো ভেবেছিলুম— বিয়ে করবো, শ্বশুরঘর যাবো, সাধ আহ্লাদ করবো। কি হোয়ে গেল!"

বহুকাল পিতৃগৃহে বাস করার পরে, অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী সারদা দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের সহিত একই ঘরে রাত্রিযাপন করিতেছেন; রামকৃষ্ণের বয়স তখন ছত্রিশ বৎসর; পার্শ্বে নিদ্রিত স্বাস্থ্যবতী পূর্ণযুবতী পত্নীকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ রতিক্রিয়া করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে অসার হইয়া পড়িলেন। ইহাই রামকৃষ্ণের প্রথম এবং সম্ভবতঃ শেষ রতিক্রিয়ায় উদ্যম। কালীবিগ্রহের পূজারী হইবার পর হইতে জীবনের মোড় যে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া গেল, একথা রামকৃষ্ণ নিজেই বহুকাল বুঝিতে পারেন নাই। তবে, তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, পত্নী সংযত থাকাতেই তিনি সংযত থাকিতে পারিতেন— "ও যদি এতো ভালো না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দেহ-বুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ —স্বামী সারদানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ড, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ৩৫৩)। রামকৃষ্ণও যে আমরণ ব্রহ্মচারী ছিলেন, ইহা তাঁহার পূর্বপরিকল্পিত নহে, ইহা ঘটনা-চক্রাধীন।

স্ত্রীলোকদর্শনে তাঁহার মনের একটি অদ্ভুত প্রতিক্রিয়াও তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে। তিনি বলিতেন, "আমি মেয়ে বড়ো ভয় করি। দেখি, যেন বাঘিনী খেতে আসছে। আর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছিদ্র খুব বড়ো বড়ো দেখি, সব রাক্ষসীর মতো দেখি। আগে ভারি ভয় ছিল, কারুকে কাছে আসতে দিতুম না। এখন তবু অনেক কোরে মনকে বুঝিয়ে, মা আনন্দময়ীর এক-একটি রূপ বোলে দেখি, ভগবতীর অংশ। হাজার ভক্ত হোলেও মেয়ে মানুষকে বেশীক্ষণ কাছে বোসতে

দিই না, একটু পরে হয় বলি, 'ঠাকুর দেখোগে যাও,' তা'তেও যদি না ওঠে,তামাক খাবার নাম কোরে বেরিয়ে পড়ি' ।" জীব-বিজ্ঞানের মতে, এরূপ মানসিক অবস্থা বিকৃত শরীর-মন গঠনের ফল ।

রামকৃষ্ণ অর্ধগৃহী, অর্ধসন্ন্যাসী

সাধারণ লোকে রামকৃষ্ণকে পরমহংস বলিতেন, বর্তমানেও অনেকে তাহাই বলিয়া থাকেন, পরমহংসদেব বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করেন। কিন্তু "পরমহংস" বলিতে যাহা বুঝা যায়, রামকৃষ্ণ তাহা ছিলেন না। পরমহংসোপনিষদে পরমহংসের লক্ষণ সম্পর্কে লিখিত আছে—

অসৌ স্বপুত্রমিত্রকলত্রবন্ধ্বাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ স্বাধ্যায়ঞ্চ সর্বকর্মাণি সন্ন্যস্যায়ং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ স্বশরীরস্যোপভোগার্থায় চ লোকস্যোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ— যিনি পুত্র, মিত্র, স্ত্রী, বন্ধু আদি সকলকে ত্যাগ করিয়া, শিখা, যজ্ঞোপবীত, যাগ, স্বাধ্যায়, সকল কর্ম বর্জন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করিয়া, নিজের দেহের উপভোগের ও লোকের উপকারের নিমিত্ত কৌপীন, দণ্ড ও আচ্ছাদন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি। পরমহংসোপনিষৎ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে "পরমহংস" শব্দটি পাওয়া যায় না। মানবধর্মশাস্ত্রে যে বলে বাসের ও তৎপরে পরিব্রজনের বিধান আছে, তাহাই পরবর্তী কালে পরমহংসের অবস্থা বলিয়া পরমহংসোপনিষদে বর্ণিত।

সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্··· বসীত চর্ম চীরং বা জ্বাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ ইত্যাদি অনু ৬।১-৩৪।

"পরমহংস" আখ্যা দেওয়া যায়, এইরূপ একটি ব্যক্তির কথা রামকৃষ্ণ নিজেই ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন। "দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল— পূর্ণ জ্ঞানী। ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি— এক হাতে একটি ভাঁড়, আবচারা ; গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে, কোন সন্ধ্যা আহ্নিক নাই, কোছড়ে কি ছিল তাই খেলে। ·· অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই— তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগলো— যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। ···যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল, ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, 'তোকে আর কি বলবো! এই ডোবার জল

আর গঙ্গাজলে যখন কোন ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে'।'' এই লোকটি পরমহংস।

রামকৃষ্ণ পরমহংস নন; তিনি অর্ধগৃহী, অর্ধসন্ন্যাসী। লালপেড়ে কাপড় পরিতেন, গায়ে জামা দিতেন, পায়ে মোজা দিয়া বার্নিশ করা চটি জুতা পরিতেন, শীতে মোল্স্কিনের র্যাপার ব্যবহার করিতেন, খাটের উপর মশারি খাটাইয়া বিছানায় শয়ন করিতেন, বিবাহ করিয়া স্ত্রী সারদার সান্নিধ্যে বাস করিতেন, সারদাকে তাঁহার জন্য রন্ধন করিয়া দিতে হইত, এমনকি মালসায় তাঁহার ত্যক্ত মল পর্যন্ত পরিষ্কার করিতে হইত। খাওয়া পরা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে বিলাস-বাসনা জাগিতো— কখনও বা বড়োবাজারের রং করা সন্দেশ বা ধনে-খালির খইচূর বা কৃষ্ণনগরের সরভাজা খাওয়ার ইচ্ছা হইত, কখনও বা সোনার গোট পরার ইচ্ছা হইত, কখনও বা সাচ্চা জরির পোষাক পরিয়া আঙ্গুলে আংটি দিয়া রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হইত। এগুলি পর্যন্ত গৃহীর ভাব। কিন্তু তিনি নিজের বা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য নিজে উপার্জন না করিয়া অপরের দানের উপর নির্ভর করিতেন, স্ত্রী-সহবাস করিতেন না, এবং অধিকাংশ সময়ে ভগবদ্ভাবে ভাবিত থাকিতেন। এগুলি সন্ন্যাসীর ভাব। রামকৃষ্ণের ভাব গৃহী ভগবদ্ভক্তের ভাব ছিল— ভাগবতে বর্ণিত প্রহ্লাদের ভাব, ভক্তমালে বর্ণিত বিঠল দাসের ভাব।

ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্গায়তি ক্বচিৎ॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ॥

(ভাগবত ৭।৪।৩৯-৪১)

—ঈশ্বরের চিন্তায় বালক প্রহ্লাদের কখনও রোদন, কখনও বা হাস্য, কখনও গান গাওয়া, কখনও বা চীৎকার, কখনও নৃত্য, কখনও বা ঈশ্বরের অনুকরণ, কখনও বাহ্যজ্ঞান হারানো, কখনও বা আনন্দে চক্ষে জল।

কৃষ্ণকথা ইষ্ট গোষ্ঠি কীর্তন নর্তন।
করিতে লাগিলা কেলি বৈষ্ণবের গণ॥

শ্রীমান বিঠল দাস শুনিতে শুনিতে।
প্রেমানন্দে অচেতন নাহিক সম্বিতে॥
কতেক রাত্রের পর উঠি বাহ্যহীন।
নাচিতে লাগিলা মাত্র প্রেমের অধীন॥

(ভক্তমাল— চরিত্র শ্রীবিঠল দাস)

রামকৃষ্ণ গৃহী ছিলেন, এবং গৃহীর ন্যায় নিজের স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকিতেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির-সংলগ্ন গৃহে সারদা দেবীকে পর্দার আড়ালে অতি গোপনে অতি কষ্টে বাস করিতে হইত, তিনি সময়মতো শরীরের প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলি করিতে পারিতেন না, ফলে, অকালে তাঁহার শরীরে বাত ধরিয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীহীন জীবনে সঙ্গ দিতে মাঝে মাঝে একটি বৃদ্ধা আসিতেন; বৃদ্ধাটি যৌবনে অসতী ছিলেন, কিন্তু প্রাসঙ্গিক সময়ে হরিনাম লইয়াই থাকিতেন; জানিতে পারিয়াই রামকৃষ্ণ সারদা দেবীকে বৃদ্ধার সহিত মিশিতে বারণ করিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণের নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল যে সারদা দেবীর নিকট বেশি যায়, ইহাও রামকৃষ্ণ পছন্দ করিতেন না। রামকৃষ্ণ নারীচরিত্র সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এরূপ মনে হয় না।

কোনও গুণী পুরুষের কথা শুনিলেই রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তিনি এইভাবে গিয়া দেখা করেন। তাঁহার এই আচরণে তাঁহার প্রসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ সুফল ফলিয়াছিল, সাধারণত সন্ন্যাসীরা বা ভগবদ্ভক্তেরা যথাসাধ্য লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া থাকিতেই ভালোবাসেন, ফলে, এইসব সাধু পুরুষের কথা লোকে কিছু জানেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি সকলের সম্মুখে অনর্গল ঈশ্বরের কথা বলায় ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করায় অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরভক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং অন্য ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া, কেশবচন্দ্র সেনের সহিত সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণের নামপ্রচারের দিকে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বা ঈশ্বরচন্দ্র পাল্টা দেখা করেন নাই, কিন্তু কেশব করিয়াছিলেন। এবং কেশব রামকৃষ্ণের ভগবদ্ভক্তি লক্ষ করিয়া তাঁহার কথা স্বকীয় *Indian Mirror* নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে

প্রকাশ করেন। সেসময়ে কেশব ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, জনসমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। একটি ইংরাজি পত্রিকায় প্রকাশিত কেশবের প্রশংসা-পত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু ধর্মানুসন্ধী পুরুষকে দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট করিয়াছিল, যুবক নরেন্দ্রনাথ দত্ত তন্মধ্যে অন্যতম ; এই নরেন্দ্রনাথ দত্তই কয়েক বৎসর পরে "স্বামী বিবেকানন্দ" এই নাম গ্রহণ করিয়া খ্রীষ্টধর্মীয় মিশনের অনুকরণে "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, এবং এইভাবে রামকৃষ্ণের নাম স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জিনিস বিক্রয়ের জন্য যেমন প্রচারের দরকার, নামের জন্যও সেইরূপ প্রচারের দরকার।

লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতাও রামকৃষ্ণের ছিল। কোনও অবিবাহিত কিশোর বা যুবককে দেখিয়া সুলক্ষণযুক্ত মনে হইলে রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিষ্ট কথা বলিতেন, স্নেহভরে গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন, খাবার খাইতে দিতেন— উদ্দেশ্য, কিশোরটি বা যুবকটি যাহাতে রামকৃষ্ণের নিকট আসেন বা থাকেন, এবং ঈশ্বরের নাম সম্বল করিয়া আজীবন অবিবাহিত থাকেন। এই উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনবোধে, তিনি mesmerize বা সম্মোহিত করিতেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে তিনি সম্মোহিত করিয়াছিলেন। সম্মোহিত করার কথা তিনি স্বয়ং ভক্তদের নিকটে বলিয়াছেন, —"কথা কইতে কইতে অমন কোরে ছুঁয়ে দি কেন জানিস ? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কোমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বোলে।"

জীবনের শেষ দশ-বারো বৎসর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তাঁহার ঘরটিতে খাটের উপর বসিয়া ভক্তদের নিকট ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলিয়া কাটাইয়াছেন— কখনও কথা বলিতেছেন, কখনও ঈশ্বরীয় গান গাহিতে-ছেন, কখনও ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, কখনও বা ভাবে নাচিতেছেন— হয়তো পরনের কাপড় ঠিক নাই, উলঙ্গ। বলরাম বসু, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, রামচন্দ্র দত্ত— এইসকল ভক্তের গৃহেও মাঝে মাঝে যাইতেন, এবং সেখানেও ঐরূপ আচরণই করিতেন। নিজের ভক্তগণের নিকট বলিতেন যে, তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতা কালীর নিকট প্রার্থনা জানাইতেন যেন তিনি "শুকনো সাধু" না হইয়া "রসেবশে" থাকেন, অর্থাৎ, যেন লোক সংসর্গ ত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বরোন্মত্ত হইয়া থাকার পরিবর্তে অপরাপর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গে কাল কাটাইতে

পারেন। বাস্তবিক সেইভাবেই তিনি জীবন কাটাইয়াছেন। সেই-ভাবেই সকল মানুষের থাকাও তিনি পছন্দ করিতেন। প্রিয় ভক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঈশ্বরসাধনায় তন্ময় হইয়া থাকিতে চাহিলে তিনি এই-জন্যই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিলেন — নিজে ভক্ত হইয়া নির্জনে থাকিলে চলিবে না, রামকৃষ্ণের মতো থাকিতে হইবে, "হাবাতে কাঠ" হইয়া নিজে কোনওরকমে ভাসিলে চলিবে না, "বাহাদুরি কাঠ" হইয়া নিজেও ভাসিতে হইবে, অপরকেও ভাসাইয়া রাখিতে হইবে।

রামকৃষ্ণের শরীর কিছু স্থূল ছিল, কিন্তু কর্মক্ষম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা সম্ভবতঃ কোনও দিনই ছিল না। তিনি কখনও দৈহিক ব্যায়াম করেন নাই, এবং আজীবন পেটের অসুখে ভুগিয়াছেন। সেইজন্য খাদ্যের মধ্যে বিশেষভাবে গাঁদাল, ডুমুর ও কাঁচকলার ভক্ত ছিলেন। পেট বুঝিয়া রাঁধিয়া দিবার ভার ছিল পত্নী সারদা দেবীর উপর। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অতিসামান্য হাঁটিতেও পারিতেন না, পালকির বা গাড়ির প্রয়োজন হইত। দুর্বল শরীর ও ভাবপ্রবণতা সাধারণতঃ পরস্পরের সঙ্গী।

রামকৃষ্ণের মৃত্যু

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রল মাসে, রামকৃষ্ণের বয়স যখন প্রায় উন-পঞ্চাশ বৎসর, তাঁহার অন্তিম পীড়া গলায় ক্যানসার বা কর্কট রোগের সূত্রপাত হইল। তাঁহার এই রোগটি হইবার কারণ বলা শক্ত। ইহা একটি (virus) ভাইরাস্-জনিত বলিয়া বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এই ভাইরাস্টি এক ব্যক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারে, অপরকে পারে না কেন, এই প্রশ্ন আসে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণের মতে, তামাকের ধূমপান গলায় ক্যানসারের অন্যতম কারণ। অতিরিক্ত কথা বলিয়া গলার মাংসপেশীকে ক্লান্ত করিয়া ফেলা সহায়ক কারণ হইতে পারে। রামকৃষ্ণ তামাকের ধূমপান করিতেন, অত্যধিক কথা বলিতেন ; এবং ইহা ভিন্ন, তিনি গরমের মধ্যে বেশি বরফ খাইতেন, যাহার ফলে স্থানীয় পেশী আরও দুর্বল হইয়া পড়িত। সর্বোপরি, জন্মগত কারণে কোনও ব্যক্তি কোনও রোগের প্রতি প্রবণ হইতে পারেন। যে-কারণেই হউক, রামকৃষ্ণ এই অতিযন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির শিকার হইলেন। এবং এই ব্যাধির ফলে তাঁহাকে কেবল দৈহিক যন্ত্রণা দিনের পর দিন ভোগ করিতে হইল তাহা নহে, তীব্র মানসিক যন্ত্রণাও ভুগিতে হইল—

তিনি মানুষের সহিত কথা বলিয়া আনন্দ পাইতেন, সে-পথ একপ্রকার বন্ধ হইল। এ সময়ে রাসমণি বা রাসমণির জামাতা মথুরামোহন দুই-জনের একজনও জীবিত নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণের অন্য ধনী রসদদার জুটিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক সময়ে বিশেষভাবে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র অর্থ সাহায্য করিতেছেন। কয়েকজন তরুণ ভক্তও জুটিয়াছেন, যাঁহারা সেবা করিতে পারেন, ইঁহাদের কয়েকটিকে জোগাড় করিয়াছেন বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন্ ইন্‌স্টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি "ছেলেধরা মাস্টার" নামে ঐ সময়ে পরিচিত হইয়াছিলেন। কয়েকজন ভক্ত তখন রামকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তগণ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। পরমভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন, "অবতারের এ কি লীলা!" সুচিকিৎসার ও স্থান পরিবর্তনের উদ্দেশ্য লইয়া ভক্তগণ রামকৃষ্ণকে প্রথমে উত্তর কলিকাতার একটি গৃহে, পরে, কলিকাতার সংলগ্ন উত্তরে কাশীপুর নামক অঞ্চলের একটি গৃহে, স্থানান্তরিত করেন। অন্যান্যের মধ্যে এ দেশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসুখ কমিবার কোনও লক্ষণই দেখা দিল না— গলায় অসহ্য বেদনা, কিছু খাইতে পারেন না, সুজির পায়স গলাধঃকরণ করিতে গেলে এক এক সময়ে নাক দিয়া বাহির হইয়া যায়, গলা দিয়া রক্ত পড়ে। পরম ভগবদ্ভক্ত রামকৃষ্ণ কি এইভাবে নিদারুণ কষ্ট পাইয়া মরিবেন?

রামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে ইষ্টদেবতা কালীকে ডাকিতে লাগিলেন, "মা, ভালো কোরে দাও, আর কুল্‌ফি খাবো না"; স্থির করিলেন যে, ভক্ত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষের পাপে তাঁহার শরীরে এই ব্যাধি ধরিয়াছে। নরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ তরুণ ভক্তগণ একটি ঘরে সমবেত হইয়া will force অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেন। পত্নী সারদা দেবী তারকেশ্বরে গিয়া শিবমন্দিরে "হত্যা দিয়া" দুই দিন অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। প্রার্থনা, ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগ, "হত্যা"— সবই জলে গেল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যান্‌সার্ ব্যাধির প্রতিকারের উপায় না থাকায় দৈব উপায় ব্যর্থ হইল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অগাস্ট রামকৃষ্ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। ঠিক বয়স বলা যায় না, কারণ,

তাঁহার জন্ম-তারিখ সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থে জন্মের তারিখ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই তারিখই বর্তমানে স্বীকার করিতে হয়।

রামকৃষ্ণ-চরিত্রে নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরতন্ময়তা

রামকৃষ্ণের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দুইটি— আমরণ ব্রহ্মচর্য পালন এবং ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরভক্তি তাঁহার মধ্যে কালীপ্রতিমা ভক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এ-বিষয়ে তিনি বঙ্গভূমির পূর্বতন খ্যাতনামা ঈশ্বরভক্ত রামপ্রসাদ সেনের মানসশিষ্য। রামপ্রসাদ সেন খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে দক্ষিণেশ্বরের কয়েক মাইল উত্তরে হালিসহর নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি কালী সাধক ছিলেন, এবং কালীর নামে ভক্তিমূলক সংগীত রচনা করিয়া গান করিতেন। তাঁহার রচিত সংগীতগুলি রাম-কৃষ্ণের জন্মের কিছু পূর্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। রামকৃষ্ণের সময়ে ঐ গানগুলি লোকমুখে বহুল প্রচারিত ছিল, এবং রামকৃষ্ণ শুনিয়া শুনিয়া অনেকগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণে-শ্বরে কালীমূর্তির পূজারী হওয়া, রামপ্রসাদ-প্রণীত শ্যামাসঙ্গীতগুলি স্মৃতিপটে থাকা এবং রামপ্রসাদের কালীসাধনা সম্পর্কে জনশ্রুতি— এই তিনের সমন্বয় রামকৃষ্ণকে অন্য দেবদেবী ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে কালীর ভাবে ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। জনশ্রুতি ছিল, রামপ্রসাদ কালীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, রামকৃষ্ণেরও প্রাণপণ চেষ্টা হইল রামপ্রসাদের ন্যায় কালীর দর্শন পাওয়া। কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকিয়া ডাকিয়া তিনিও কালীর দর্শন পাইয়াছিলেন। এই কথা রামকৃষ্ণ ভক্তদের নিকট প্রচার করিতেন। রামপ্রসাদ যেরূপ গানের মধ্যে কালীকে "মা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, রামকৃষ্ণও ঠিক সেইভাবে কালীকে "মা" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। রামপ্রসাদ-রচিত বহু শ্যামাসঙ্গীত রামকৃষ্ণ ভক্তগণের সমক্ষে গাহিতেন —"কে জানে কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন", "মন রে কৃষিকাজ জানো না", "ডুব দে রে মন কালী বোলে", "আমি এই খেদ খেদ করি", "আয় মন বেড়াতে যাবি", ইত্যাদি। রামপ্রসাদের গানের মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি ছোটো ছোটো উপমার সাহায্যে দর্শনের বড়ো বড়ো ভাব প্রকাশ করিতেছেন। অদ্বৈতবাদাত্মক যুক্তিবাদের

এবং ভক্তিবাদের মূল তাৎপর্য ও পার্থক্য তিনি সামান্য কয়েকটি কথায় প্রকাশ করিতেছেন—

নির্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায়ে জল,
ওরে, চিনি হওয়া ভালো নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি।

যুক্তিবাদের, অদ্বৈতবাদের কথা— সব এক, এক জলে জলময়, জীবাত্মা বলিয়া পৃথক্ কিছু নাই, একটিই মাত্র আত্মা, বহু আত্মা নাই। রামপ্রসাদ বলিতেছেন— এই জাতীয় কথা মনে করায় ফল কি? জীবাত্মা পৃথক্ পৃথক্ আছেন, এই ধারণা থাকিলে কোনও জীবাত্মার পক্ষে পরমাত্মার স্পর্শ সুখের সম্ভাবনা তো থাকে! দ্বৈতবাদ ভক্তিবাদ স্বীকার করেন যে পৃথক্ জীবাত্মা আছেন, রামপ্রসাদের মতে, এই দ্বৈতবাদই ভালো, এই বাদে বিশ্বাসী পরমাত্মাকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া পরমাত্মার রস আস্বাদন করিতে পারেন। রামপ্রসাদ বলিতেছেন—পরমাত্মা চিনিস্বরূপ, নিজে সেই চিনি হইয়া লাভ কি, পিঁপড়া হইয়া চিনি আস্বাদ করাই আমি ভালোবাসি। রামপ্রসাদের এই উক্তি, "ওরে, চিনি হওয়া ভালো নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি," বাংলা ভাষায়, জগতের সমস্ত ভাষায়, ভক্তিবাদের অতুলনীয় অভিব্যক্তি। অপর একটি গানে, রামপ্রসাদ সংসারে জীবের অবস্থা কি, তাহা একটি ছোটো উপমা দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন— মানুষ চলিতেছে, "কলুর চোক ঢাকা বলদের মতো", ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইয়া মানুষ ঘুরিতেছে, যেমন ঘোরে ঘানির বলদ চক্ষু ঢাকা অবস্থায়। ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তদের নিকট উপমা দিয়া দার্শনিক ভাব বুঝাইতেন, তাঁহার বলা কয়েকটি উপমা রামপ্রসাদের নিকট অবিকল ধার করা। রামপ্রসাদের পূর্বোল্লিখিত গানের ছত্র, "চিনি হওয়া ভালো নয়, চিনি খেতে ভালোবাসি", রামকৃষ্ণ মাঝে মাঝেই বলিতেন। রামকৃষ্ণের অপর একটি প্রিয় কথা, "গায়ে হলুদ মেখে ডুব দিলে যেমন হাঙ্গরে কুমীরে ধরে না, তেমনি বিবেকবৈরাগ্য থাকলে কামাদি রিপু হোতে ভয় নাই", এটি রামপ্রসাদের "ডুব দে রে মন কালী বোলে", ইত্যাদি গান হইতে লওয়া।

চরিত্রের প্রকাশ পায় ঘটনায়, রামকৃষ্ণের চরিত্রের বিভিন্নদিকের উপর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা আলোকপাত করিয়াছে।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ শালুমোড়া মোলস্কিনের র‍্যাপার গায়ে দিয়া দাড়ি কামাইতে বসিয়াছেন। প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?" উত্তরে "হাঁ" শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওরে রামলাল, যাঃ, বিয়ে কোরে ফেলেছে!" রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তখন দক্ষিণেশ্বরের কালীর পূজারী। রামকৃষ্ণ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, "ছেলে হয়েছে?" এবারেও অস্তিবাচক উত্তর শুনিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, "যাঃ, ছেলে হোয়ে গেছে!" রামকৃষ্ণের আশার পাহাড় ভাঙিয়া পড়িল। রামকৃষ্ণ চান, লোকে যেন বিবাহ না করে, "সংসারী" না হয়, ভগবানের নাম লইয়া দিন কাটায়। অন্ততঃ, এই শ্রেণীর লোককে তিনি পছন্দ করেন, এবং নিজের কাছে দেখিতে চান, বা, রাখিতে চান। মহেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এই দ্বিতীয়বার, মহেন্দ্রনাথ ঈশ্বরানুরাগী রামকৃষ্ণ তাহা বুঝিয়াছেন, বয়সও তেমন বেশি নয়, কাজেই, রামকৃষ্ণ মনে মনে আশা-পোষণ করিতেছিলেন, এই বুঝি একটি দলের মানুষ পাওয়া গেল। মহেন্দ্রনাথ বিবাহিত এবং সন্তানের জনক জানিতে পারিয়া রামকৃষ্ণ মর্মাহত হইলেন।

রামকৃষ্ণের মূল কথা— নারীসঙ্গ বর্জন করো, "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করো", "সংসারকে পাতকূয়া বিশালাক্ষীর দ' মনে করো", "আত্মীয়-দের কালসাপ মনে করো", "যে 'আমি'তে সংসারী করে, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত করে, সেই 'আমি' খারাপ, "সংসারী জীব বিকারের রোগী", "যে মন ভগবান্‌কে দিতে হবে, সেই মনের বারো আনা যখন মেয়েমানুষ নিয়ে ফেলে, এবং ছেলে হোলে প্রায় সবটাই খরচ হোয়ে যায়, তখন ভগবান্‌কে আর কি দেবে", "মাছপানে কিছু দোষ নাই, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ", "মেয়েমানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয়, তবে যদি ভগবান্‌কে লাভ হয়"; বলিতেন, "যখন দেখি স্ত্রী-পুরুষ এক জায়গায় বোসে আছে, তখন বলি, 'আহা, এরা গেছে' "; বলিতেন, "টাকাতেই বা কি আছে, সুন্দরীর দেহেতেই বা কি আছে. বিচার করো, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্বি মল মূত্র এইসব আছে, এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়, কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?" বলিতেন, "একজন পেট-বৈরাগীও চরিত্রবান্ গৃহী অপেক্ষা ভালো।"

হরিশের প্রশংসার ব্যাপারেও রামকৃষ্ণের এই মনোভাব ফুটিয়া

উঠিয়াছে। হরিশ বিবাহিত ও সন্তানের জনক হইয়াও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণ হরিশের মন বুঝিবার জন্য তাঁহাকে একবার বাড়ি গিয়া দুঃখকাতর স্ত্রীকে দেখা দিয়া আসিতে বলিলেন। হরিশ অস্বীকার করিয়া বলিলেন, স্ত্রী কাতর বলিয়া স্ত্রীকে দেখা দেওয়া উচিত নয়, এ-বিষয়ে দয়া দেখানো চলে না। এই উত্তরে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দিত হন, এবং হরিশের কথাগুলি অপর তরুণ ভক্তদিগের নিকট সপ্রশংসভাবে বলিতেন।

যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র লইয়া অর্থোপার্জন করিয়া সংসার করিতেছেন, এরূপ কয়েকজন ভক্তের প্রতি রামকৃষ্ণ ভিন্ন ধরনের উক্তিও করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে বলিতেন, "অনাসক্ত হোয়ে সংসার করো, হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গো," "পাঁকাল মাছ যেমন কাদায় থাকলেও গায়ে কাদা লাগে না, তেমনি সংসারে থাকো," "বড়ো মানুষের বাড়ির দাসীর মতো থাকো," ইত্যাদি। কিন্তু এগুলি যে তাঁহার অন্তরের কথা নয়, তাহা একটি ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রল— মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে। কলিকাতায় ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উপস্থিত, গিরিশের হাতে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের লেখা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনী। ঐ পুস্তকে ত্রৈলোক্য এইমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রামকৃষ্ণ আগে সংসারের উপর বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া মত বদলাইয়াছেন, এবং এখন বলেন যে, সংসারেও ধর্ম হয়। ত্রৈলোক্যের এই মত প্রকাশের কথা পূর্বেই রামকৃষ্ণকে জানানো হইয়াছিল। এখন গিরীশের হাতে বইখানি দেখিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মরা) ঐ নিয়ে আছে, তাই 'সংসার' 'সংসার' করছে, কামিনী-কাঞ্চনের ভেতর রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে ওকথা বলে না ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হোয়ে যায়। আমি আগে সব 'ছি' কোরে দিছলুম। বিষয়িসঙ্গ তো ত্যাগ করলুম, আবার মাঝে ভক্ত সঙ্গ-ফঙ্গও ত্যাগ করেছিলুম। দেখলুম, পট্ পট্ মোরে যায়, আর, শুনে ছটফট করি। এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একটু লোক লইয়া থাকিবার জন্যই তিনি মুখে বলেন, সংসারে থাকিয়াও ধর্ম হয়— প্রায় সব মানুষই সংসারী,

ঐরূপ কথা তিনি না বলিলে লোকে তাঁহার কাছে আসিবেন কেন—কিন্তু তাঁহার অন্তরের কথা ভিন্ন। কিছুক্ষণ পরে স্পষ্টভাবেই বলিলেন, "সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে, সব বন্ধ, ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়? একটু আলো এলে কি হবে? কামিনীকাঞ্চন ছাদ। ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়? সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হোয়ে আছে।"

সংসার ত্যাগ করা ব্যাপারে পিতামাতা বাধা দিলে তাঁহাদের নির্দেশ লঙ্ঘন করা কর্তব্য, একথাও রামকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন। যদি কাহারও মাতা পুত্রকে রামকৃষ্ণের নিকট আসিতে বারণ করেন, তাহা হইলে কি কর্তব্য, এই প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেন, 'যে মা ওকথা বলে, সে মা নয়, সে অবিদ্যারূপিণী, সে মা-র কথা না শুনলে কোনও দোষ নাই, যে মা ঈশ্বরলাভের পথে বিঘ্ন দেয়, ঈশ্বরলাভের জন্য গুরুজনের বাক্যলঙ্ঘনে দোষ নাই।" ছোট নরেনকে একদিন বলিলেন, "তুই বাপ মা'কে খুব ভক্তি করবি, কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবি নি, খুব রোক আনবি, শালার বাপ।" বলা বাহুল্য, স্ত্রী সম্পর্কেও অনুরূপ আচরণের নির্দেশ রামকৃষ্ণ দিয়াছেন। "স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছো না, আমি আত্মহত্যা করবো, তা'হোলে কি হবে।" মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই প্রশ্নের উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, আত্মহত্যাই করুক, আর যা'ই করুক।"

সন্তানের প্রতি কিরূপ আচরণ সঙ্গত, এ-বিষয়ে রামকৃষ্ণের মত প্রকাশ পায় একদিনের ঘটনায়। এক ব্যক্তি রামকৃষ্ণের নিকটে কিছুক্ষণ বসিয়া, "যাই, একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে", এই কথা উচ্চারণ করিলে, রামকৃষ্ণ রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে রে শালা, ওঠ এখান থেকে, ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ!"

ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জন করার প্রতি রামকৃষ্ণ বিরূপ ছিলেন। দুর্গাচরণ নাগ চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। একদিন তাঁহার কানে আসিল, রামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন, "দ্যাখো, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন", এবং পরে বিশেষভাবে চিকিৎসকদের সম্পর্কে, "এতটুকু ওষুধে মন পোড়ে থাকলে, কি কোরে বিরাট ব্রহ্মের ধারণা হবে?" এই

কথা শুনিয়া দুর্গাচরণ নিজের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্স ও পুস্তকাদি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন।

রামকৃষ্ণ অর্থোপার্জন করা পছন্দ করিতেন না, এবং একদিন "টাকা মাটি, মাটি টাকা", এই কথা বলিতে বলিতে কয়েক খণ্ড মুদ্রা গঙ্গায় ফেলিয়া দেন।

আর একদিনের ঘটনা। রামকৃষ্ণের জনৈক তরুণ ভক্ত শশিভূষণ চক্রবর্তী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ির ঘরে বসিয়া ফার্সি ভাষা শিখিতেছেন, উদ্দেশ্য, সূফী কবিদের মূল রচনা পড়া। রামকৃষ্ণ তিনবার ডাকা সত্ত্বেও পড়ায় তন্ময়তার ফলে শশী উত্তর দিলেন না। রামকৃষ্ণ কি এই প্রগাঢ় মনঃসংযোগের প্রশংসা করিলেন ? না ; কারণ, ইহা তো ঈশ্বরে তন্ময়তা নয়, ইহা বিদ্যাশিক্ষার তন্ময়তা। রামকৃষ্ণ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'অপরা বিদ্যালাভের জন্য যদি তুই ধর্মবিষয়ক কর্তব্য অবহেলা করিস, তোর ভক্তিলাভ হবে না।" শশী ফার্সি বইগুলি গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলেন। রামকৃষ্ণের মতে, বিদ্যাশিক্ষা অপরা বিদ্যাশিক্ষা, সুতরাং বর্জনীয়।

শুধু যে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন নাই তাহা নয়, শাস্ত্রগ্রন্থও বিশেষ পড়ার প্রয়োজন নাই। রামকৃষ্ণ সপ্রশংসভাবে উল্লেখ করিতেন জনৈক রামাইৎ সম্প্রদায়ের সাধুর কথা, যাঁহার প্রিয় গ্রন্থ খুলিয়া দেখা গেল, কেবল লাল কালিতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রহিয়াছে, "ওঁ রামঃ"। "মেলা বই পোড়ে কি হবে, এক ভগবান্ থেকেই তো বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে।" রামকৃষ্ণ বলিতেন, "বেশি শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয় ; শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়, তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার ? সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়, ঈশ্বরলাভের জন্য।"

অন্য একদিনের ঘটনা। কামারহাটিতে বালবিধবা অঘোরমণির গৃহে আহারান্তে বালকভক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষের সহিত রামকৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছেন। দিবা দ্বিপ্রহর। রামকৃষ্ণের এক অপূর্ব দর্শন হইল। পরবর্তীকালে তিনি ভক্তদের নিকটে এই সম্পর্কে বলিতেছেন—

"একটা দুর্গন্ধ বেরুতে লাগলো ; তারপর দেখি, ঘরের কোণে দুটো মূর্তি ! বিটকেল চেহারা, পেট থেকে বেরিয়ে পোড়ে নাড়িভুঁড়িগুলো ঝুলছে, আর, মুখ, হাত, পা, মেডিকেল কলেজে যেমন একবার মানুষের হাড়গোড় সাজানো দেখেছিলাম, ঠিক সেইরকম। তা'রা আমাকে

অনুনয় কোরে বলচে, 'আপনি এখানে কেন ? আপনি এখান থেকে যান আপনার দর্শনে আমাদের বড়ো কষ্ট হচ্ছে।' ওখানে দুটো ভূত আছে। বাগানের পাশেই কামারহাটির কল— ঐ কলের সাহেবেরা খানা খেয়ে হাড়গোড়গুলো যা' ফেলে দেয়, তা'ই শোঁকে ও ঐ ঘরে থাকে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম সংস্করণ, পৃ ৩০৬)। রামকৃষ্ণ কালী দর্শন করিয়াছিলেন, যিশুকে দর্শন করিয়াছিলেন, মহম্মদকে দর্শন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনে গোপাল দর্শন করিয়াছিলেন, সাধারণ ভূতও দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ছা মূর্ছাও ভাবাবেশ ও ধাতু ছুঁইতে না পারা যে-শ্রেণীর স্নায়বিক গঠনের ফল, এই দর্শনগুলিও সেই গঠনের ফল— তাঁহার স্নায়বিক গঠন অস্বাভাবিক বিকৃত ছিল। এই জাতীয় স্নায়বিক গঠন সময়ে সময়ে কবি বা ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে দেখা যায়। এ-বিষয়ে Forster (ফর্স্টার্) রচিত ইংরাজ ঔপন্যাসিক Charles Dickens-এর (চার্লস্ ডিকন্-সের) জীবনী হইতে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে—

"Dickens once declared to me", Mr. Lewes continues, "that every word said by her characters was distinctly heard by him ; I was at first not a little puzzled to account for the fact that he could hear language so utterly unlike the language of real feeling and not be aware of its preposterousness ; but the surprise vanished when I thought of the phenomenon of hallucination." (Vol. II, p. 194)। দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, দিব্যস্পর্শন, মানসিক তমসা। অতি ভাবপ্রবণ চিত্তে অতিতন্ময়তা আত্মপ্রবঞ্চনার জননী।

হয়তো রামকৃষ্ণের আরও কয়েকটি সংস্কারের কারণ তাঁহার মনের এই কোণেই খুঁজিতে হইবে। তিনি বলিতেন, "খল হোলে হাত ভারি হয়", "নাকটেপা হওয়া ভালো না", "ঊনপাঁজুরে লক্ষণ ভালো না, আর হাড়পেকে, কনুয়ের গাঁট মোটা, হাত ছিনে, আর বিড়ালচক্ষু", "ঠোঁট ডোমের মতো হোলে নীচবুদ্ধি হয়, আরও খারাপ লক্ষণ একচক্ষু, আর ট্যারা, ভারি দুষ্ট ও খল হয়", "পুরুষাঙ্গের উপর চামড়াটি মুসলমানদের মতো যদি কাটা হয়, সে একটি খারাপ লক্ষণ।" টিকটিকি

পড়িলে হাতের কাজে বাধা পড়িল মনে করিতেন। বলিতেন, "হ্যাঁ গো, ও সব মানতে হয়।"

রামকৃষ্ণ প্রথম জীবনে বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু ক্রমে গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ভক্তদের ভক্তির আতিশয্যে অহমিকায় পূর্ণ হইয়া ওঠেন, এবং নিজকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। তিনি কী ধরনের প্রশংসাবাদের পাত্র হইতেন, তাহার একটি নমুনা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বার। শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ দুই একটি বন্ধু সঙ্গে গাড়ি করিয়া আসিয়া উপস্থিত। কিছু পান করিয়াছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে আসিতেছেন, ও ঠাকুরের চরণে মাথা দিয়া কাঁদিতেছেন। ...গিরীশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় করিয়া বলিতেছেন, "তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম, তা' যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড়ো খেদ রইলো, তোমার সেবা করতে পেলুম না। ... দাও বর ভগবান্, এক বৎসর তোমার সেবা করবো। মুক্তি ছড়াছড়ি, প্রস্রাব কোরে দি। বলো, তোমার সেবা এক বৎসর করবো (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৭৬-৭৭)?" গিরীশ নটবর।

এ জাতীয় উচ্ছ্বাসে মানুষের মাথা ঠিক রাখা শক্ত। ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন জানিয়া রাম-কৃষ্ণও বলিতে শুরু করিলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ —তবে, এবার গুপ্তভাবে আসা, যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন।" বলিতে লাগিলেন, "এর ভিতরে কে আছেন, আমার বাপেরা জানতো, বাপ গয়াতে স্বপ্ন দেখেছিলেন, রঘুবীর বলছেন, 'আমি তোমার ছেলে হবো।' " তাঁহাকে সকল লোকে অবতার বলে কি না, এ-বিষয়ে খোঁজ লইতে লাগিলেন। ভক্তদের মধ্যে কেহ অপর কোনও সাধুর নিকটে গেলে বলিতেন, "ওখানে যেয়ো না, এখানে এসো।" গাড়িতে চলিতে চলিতে একদিন নিজমনে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "হাজরা আবার আমায় শেখায়, শালা!" 'হাজরা' অর্থে প্রতাপ হাজরা নামক জনৈক সাধু চরিত্র ব্যক্তি। অহমিকার চরম অভিব্যক্তি হয় একদিন পূর্বোল্লিখিত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত কথোপকথন সময়ে। মহেন্দ্রলাল বলিলেন, "লোকে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করে, এতে আমার কষ্ট হয়, মনে করি, এমন ভালো লোকটাকে খারাপ

কোরে দিচ্ছে। কেশব সেনকে তা'র চেলারা ওই রকম করেছিল! তোমায় বলি শোনো।" রামকৃষ্ণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমার কথা কি শুনবো? তুমি লোভী, কামী, অহঙ্কারী।" রামকৃষ্ণের অহমিকা গগনস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।

ভক্তরা রামকৃষ্ণকে রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর বলিতেন। রঙ্গরসের দুইটি উদাহরণ পূর্বোল্লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

"নরেন্দ্র, ভবনাথ, প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি সহাস্যে)— হাজরা নেচেছিল?

"নরেন্দ্র (সহাস্যে)— আজ্ঞা, একটু একটু।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটু একটু!

"নরেন্দ্র (সহাস্যে)— ভুঁড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— সে আপনি হেলে দোলে, না দোলাতে আপনি দোলে। (সকলের হাস্য)।"

(চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৪১)

এই হাজরা পূর্বোল্লিখিত প্রতাপ হাজরা।

আর একদিন রামকৃষ্ণ ভক্তগণের নিকট পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতেছেন, "একজন ন্যাংটা সঙ্গে সঙ্গে থাকতো— তা'র··· হাত দিয়ে ফচকিমি করতুম।"

(চতুর্থ ভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৫৫)

রসিকতা কিছু স্থূল মনে হয়।

চরিত্রে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য অনেক মানুষেরই থাকে না, রামকৃষ্ণেরও ছিল না। অশূদ্রযাজী, অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী পিতার পুত্র রামকৃষ্ণ প্রথমে শূদ্রা রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে আসিতেই চান নাই, পরে আসিয়াও কয়েকদিন শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অবশেষে শূদ্রমন্দিরে বাস ও শূদ্রান্ন গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, শূদ্রাপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজারীর পদও গ্রহণ করিলেন। কতকগুলি বিষয়ে তিনি জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করিতেন, অপরদিকে দুই-একটি বিষয়ে তাঁহার আচরণ সম্পূর্ণ জ্ঞানহীনের মতো। তিনি একদিকে অদ্বৈতবাদের কথা বলিতেন, অন্যদিকে তাঁহার বিবেচনায় যে পাপী সেইরূপ ব্যক্তির স্পর্শে বিরক্ত

হইতেন। ভগবতী নামে একটি পুরাতন দাসী একদিন তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই তিনি গঙ্গাজল দিয়া স্পৃষ্ট স্থান ধুইয়া ফেলিলেন। অপর একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তিনি চলিয়া গেলে রামকৃষ্ণ নিজহাতে কোদাল দিয়া খানিকটা মাটি তুলিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "ওরা যেখানে বসে, মাটিশুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।" আরও একদিন, "এ কোন্ শালার সন্দেশ," এই কথা বলিয়া সন্দেশ ফেলিয়া দিলেন, কারণ, যে ব্যক্তি সন্দেশগুলি দিয়াছিলেন তাঁহাকে রামকৃষ্ণ অসচ্চরিত্র মনে করিতেন। এইসব জাতীয় আচরণ কোনও জ্ঞানীর আচরণ নয়, যাঁহার পূর্ণ সমত্ববোধ হইয়াছে। এই আচরণ তাঁহাতেই সম্ভব যিনি মনে করেন যে, সমাজশৃঙ্খলাভঙ্গকারী ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, এই আচরণ তাঁহাতেই সম্ভব যাঁহার এ বোধ জন্মে নাই যে, এক ভিন্ন দুই নাই, ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, কর্তায় বহুত্ব নাই, কার্যে বহুত্ব নাই, ইচ্ছায় বহুত্ব নাই। অদ্বৈতবাদী জ্ঞানীর কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক ভক্তিবাদীও এ পন্থা অনুসরণ করেন না। লোক চক্ষে দুশ্চরিত্রা জনৈকা রমণী পাদস্পর্শ করিলে যিশু যে-আচরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিমন্ নামে কঠোর ধর্মাচারনিষ্ঠ জনৈক হীব্রুর গৃহে অমন্ত্রিত হইয়া যিশু আসিয়াছেন শুনিয়া ঐ অঞ্চলের পাপিনী বলিয়া পরিচিত জনৈকা রমণী সেখানে আসিয়া যিশুর পায়ের উপর অশ্রুবর্ষণ করিলেন, অশ্রুসিক্ত অঙ্গ নিজের কেশ দিয়া মুছিয়া দিলেন, পায়ে চুম্বন দিলেন, এবং সর্বশেষে পদদ্বয়ে সুগন্ধ তৈল মাখাইয়া দিলেন। কিন্তু রমণীটির সহিত স্নেহভরেই কথা বলিলেন (Luke VII, 37 to 50 দ্রষ্টব্য)। অপর একটি দিক্ দিয়া দেখিলেও রামকৃষ্ণের আচরণ স্ববিরোধী। তিনি পাপীর স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না, পাপীর প্রদত্ত আহার্য খাইতে পারেন না, পাপীর বসা জায়গার মাটি কোদাল দিয়া চাঁচিয়া ফেলেন, কিন্তু তাঁহার রসদদারেরা কি? তাঁহার প্রধান রসদদার মথুরামোহন বিশ্বাসকে জমিদারি চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় দুষ্ক্রিয়া করিতে হইত, লাঠালাঠি করিয়া মানুষ খুনও করাইতে হইয়াছিল, কিন্তু তৎপ্রদত্ত আহার্য্য খাইতে রামকৃষ্ণের কোনও দিনই অরুচি হয় নাই, তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে, কিংবা, তাঁহার জমিদারির আয়ে নির্মিত বাটিতে বাস করিতে রামকৃষ্ণের সঙ্কোচ হয় নাই।

বাল্যকাল হইতেই রামকৃষ্ণ বিচারবুদ্ধিতে দুর্বল। শুভঙ্করীতে তাঁহার ধাঁধা লাগিত, অঙ্কে আতঙ্ক উপস্থিত হইত। পরিণত বয়সে গঙ্গায় জোয়ার দেখিয়া একদিন ইহার কারণ জানিবার কৌতূহল হইল। ভক্ত শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; রামকৃষ্ণ শুনিতে শুনিতে বলিলেন, "ঐ যাঃ, বুঝতে পারছি না, মাথা ঘুরে আসছে, টন্‌টন্‌ করছে। আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন কোরে জানলে ?" বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে রামকৃষ্ণের মাথা ঘোরে, টন্‌টন্‌ করে, বিজ্ঞান তাঁহার মস্তিষ্কে ঢোকে না।

কোনও বিষয়ে বিচার করিতে গেলেই রামকৃষ্ণ বেকায়দায় পড়িতেন, মাথা টন্‌টন্‌ করিত। নিজের মনে ইষ্টদেবতা কালীর সহিত কথা বলিতেছেন— 'আচ্ছা, মা! যদি না বলতাম, 'আমি খাবো', তা' হোলে কি যেমন খিদে তেমনি খিদে থাকতো না ? তোমাকে বললেই তুমি শুনবে, আর ভিতরটা শুধু ব্যাকুল হোলে তুমি শুনবে না— তা' কখনো হোতে পারে ? তুমি যা' আছ, তা'ই আছ— তবে বলি কেন, প্রার্থনা করি কেন ? ও! যেমন করাও তেমনি করি ! যাঃ ! সব গোল হোয়ে গেল ! কোন বিচার করাও ?" বিচার করিতে গেলেই তাঁহার গোল হইয়া যায়। কাটোয়াবাসী জনৈক বৈষ্ণব প্রশ্ন করিলেন, পুনর্জন্ম হয় কি না, উত্তরে রামকৃষ্ণ বলিলেন, গীতায় আছে যে যাহা মৃত্যুকালে চিন্তা করে সে সেইভাবে পুনরায় জন্মলাভ করে। শুনিয়া বৈষ্ণবটি বলিলেন যে, এ-বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ থাকিলে বিশ্বাস হয়। ইহাতে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "তা' জানি না বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না, আবার মোলে কি হয় ! তুমি যা' বলছো, এসব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কিসে ভক্তি হয়, এই চেষ্টা করো। ভক্তি লাভের জন্যই মানুষ হোয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ পাতা, এসব খপরে কাজ কি ? জন্ম-জন্মান্তরের খপর !" শ্যাম বসু নামে অপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন, "পাপের শাস্তি আছে, অথচ ঈশ্বর সব করছেন, এ কিরকম কথা ?" এ প্রশ্নেরও রামকৃষ্ণ অনুরূপভাবে জবাব দিলেন। "কি তোমার সোনারবেনে বুদ্ধি ! ওরে পোদো, তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এসব হিসাবে তোর কাজ কি ?" জনৈক সাধক প্রশ্ন করিলেন, ঈশ্বরকে দর্শন করা

যায় কি না। রামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। প্রত্যুত্তরে সাধক বলিলেন, "কিন্তু শাস্ত্রে বলছে, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তিনি বাক্য মনের অগোচর।" ইহাতে রামকৃষ্ণ বলিলেন, "ও থাক্ থাক্! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।" দর্শনের প্রত্যেকটি মূল বিচার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া রামকৃষ্ণ কাবু হইয়াছেন।

রামকৃষ্ণ কথাময়

রামকৃষ্ণের জীবন বাক্যময়; ভক্তমধ্যে বসিয়া দিনের পর দিন তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন; নিজের উক্তির মধ্যেই তাঁহার প্রধান পরিচয়। সেইজন্য তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার উক্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়। তাঁহার অন্যতম ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পূর্বোল্লিখিত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত" নামক গ্রন্থে রামকৃষ্ণের বহু উক্তি যথাযথ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি প্রামাণ্য বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত। গ্রন্থটি হইতে কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করা হইতেছে।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই বলিতেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু"। এই উক্তিটি সম্পূর্ণ ভুল, ভেদবুদ্ধিপ্রসূত। ইহার ভিত্তি এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পদার্থ আছে, ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট অস্তিত্ব এবং তাঁহার বাহিরেও অস্তিত্ব আছে।

ঈশ্বরের বাহিরে অস্তিত্ব নাই। ঐশী সত্তা সীমাহীন। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)। স এ বেদং সর্বম্, (ছান্দোগ্য ৭।২৫।১)। সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য ২)। ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্। (ঈশ ১)। সবই এক— জড় পদার্থ ও চেতন পদার্থ, জড়ত্ব ও চৈতন্য, সত্তা ও চিন্তা। পদার্থ ও শক্তি, কর্তা ও ক্রিয়া, ভোক্তা ও ভুক্ত, স্থান ও কাল। সবই তাঁহার সত্তা, সবই তাঁহার শক্তি, সবই তাঁহার ইচ্ছা, সবই তাঁহার কল্পনা। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু সব তিনি, ইন্দ্রিয়াতীত যাহা কিছু সব তিনি। এসবই তিনি, এসবের পরেও তিনি। তিনি সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি, সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬ কঠ ২।২।৯, ১০)। তিনি সর্বময়, সকল অস্তিত্বের অন্তর, তিনি বিভিন্নরূপ, এবং রূপহীনও। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯)। —এখানে বহু নাই। যঃ অন্যাং দেবতাম্

উপাস্তে অন্যঃঅসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি ন স বেদ (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০), যিনি ঈশ্বর আমা হইতে ভিন্ন, এই বোধে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞ। যথোর্ণ নাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যা-মোষধয়ঃ সম্ভবন্তি, যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ (মুণ্ডক ১।১।৭)—মাকড়সা যেরূপ সৃষ্টি করে ও গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেরূপ ওষধি জন্মায়, জীবিত পুরুষের যেরূপ কেশ লোম জন্মায়, বিশ্বও সেইরূপ অক্ষর হইতে জন্মায়। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বি-স্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ, তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ, সৌম্য, ভাবাঃ প্রজায়ন্তে, তত্র চৈবাপিবন্তি (মুণ্ডক ২।১।১)— যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, যে স্ফুলিঙ্গগুলি রূপতঃ অগ্নিই, সেইরূপ অক্ষর হইতে বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হয় এবং অক্ষরেই বিলীন হয়। একই সবিতা কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন। ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু, একথা বলার তাৎপর্য ছুরি দিয়া জল কাটার চেষ্টা করা, আকাশে বেড়া দিবার চেষ্টা করা।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঈশ্বরকে দেখা যায়।" বলা বাহুল্য, এই উক্তির মধ্যেও পূর্বোক্ত ভ্রান্তি। এই উক্তির ভিত্তিও ঈশ্বরের পৃথক্ সত্তা কল্পনা, খণ্ডিত ঈশ্বরের কল্পনা। প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দর্শনের আশা করা যাইতে পারে সেই চক্ষুই তিনি যে কর্ণ দিয়া তাঁহার কথা শোনার আগ্রহ হইতে পারে সেই কর্ণই তিনি, যে ত্বক্ দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে সেই ত্বক্ই তিনি, যে ইন্দ্রিয়ই হউক না কেন যাহা দিয়া তাঁহার সংস্পর্শের চেষ্টা করা যাইতে পারে সেই ইন্দ্রিয়ই তিনি, যে ধ্যানস্থ মন দিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস হইতে পারে সেই ধ্যানস্থ মনই তিনি। কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে? ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ (কঠ ২।৩।৯,১০)— কেহই ইঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখে না। ন চক্ষুষা গৃহ্যতে (মুণ্ডক ৩।১।৮)— ইনি চক্ষুর সাহায্যে গ্রহণীয় নহেন। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্ (কেন ১।৬)— মন দ্বারা যাঁহাকে মনন করা হয় না, জ্ঞানিপুরুষগণ যাঁহাকে মনের মননশক্তি বলেন— নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা, অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে (কঠ ২।৩।১২)— বাক্য বা মন বা চক্ষু দিয়া তাঁহার উপলব্ধি হয় না, অস্তি আছেন, এইমাত্র বলা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর্য ঋষিগণ

স্বীকার করিয়াছেন, ন তস্যাস্তি বেত্তা (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)— তাঁহাকে জানে এরূপ কেহ নাই, স্বীকার করিয়াছেন, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ (কেন ১।৩) —তাঁহার নিকট চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না, তাঁহাকে আমরা জানি না, তাঁহার বিষয় কীভাবে শিখাইতে হয় তাহাও জানি না। তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, জানিবার কর্তা, জ্ঞাতাকে কে জানিবে, বিজ্ঞাতাবমরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪)— বিজ্ঞাতাকে কি করিয়া জানা যাইবে, ইহা তো সম্ভব নয় ! রামকৃষ্ণ চিত্তের বিভ্রান্তি বশতঃ ভূতপেত্নী দেখিতেন, মৃত মহম্মদকে দেখিতেন, মৃত যিশুকে দেখিতেন, হিন্দুদেবতা কালীকে দেখিতেন, এবং লোককে বলিতেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখিয়াছি তোমাকেও দেখাইতে পারি।" কিন্তু তাঁহার ন্যায় মানুষকে লক্ষ্য করিয়া শত শত বৎসর পূর্বে আর্য মনীষী বলিয়া গিয়াছেন, "যস্যামতং তস্যমতং, মতং যস্য ন বেদসঃ, অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাত মবিজানতাম্" (কেন ২।৩)—ঐ যিনি জ্ঞানী, তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এরূপ মনে করেন না, যিনি জ্ঞানী নন তিনিই মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছি।

রামকৃষ্ণ বলিতেন, "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করো, ঈশ্বরকে লাভ করার চেষ্টা করো।" কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা, অর্থাৎ, নারীর সহিত যৌন সংসর্গে লিপ্ত না হওয়া এবং জীবনধারণের জন্য অর্থোপার্জন না করা, এই উপদেশ আরও কেহ কেহ পূর্বে দিয়াছেন। একটি হিন্দী দোঁহা আছে— এক কনক অওর্ কামিনী বিষফল কিয়ে উপায়, দেখে হীতে বিষ চঢ়ে, চাখত হী মর জায়— কাঞ্চন ও কামিনী দর্শনেই বিষক্রিয়া হয়, চাখিলেই মৃত্যু। ভক্তমাল নামক গ্রন্থে কেশাবরাম নামের জনৈক ভগবদ্ভক্তের কথা বলা হইয়াছে—যা'রে দেখে তা'রে কহে, কৃষ্ণপদ ভজ, বিষয় বিষম বিষ, এইক্ষণে ত্যজ। কেহ বা অতদূর না গিয়া একটু সাবধানে থাকিতে বলিয়াছেন— পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ানুপসেবমানো ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্, সঙ্গীতবাদ্যকতিতানবশংগতাপি মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীর— মাথায় কলস রাখিয়া নর্তকী যেরূপ সঙ্গীত ও বাদ্যের তালে তালে নাচিতে পারে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় ভালো-ভাবে ভোগ করিয়াও মুকুন্দের চরণকমল ত্যাগ করেন না।

যিশু স্বয়ং অবিবাহিত থাকিলেও যৌনক্রিয়া ত্যাগের পরামর্শ দেন

নাই, বরঞ্চ বিবাহ করা স্ত্রীর সহিত ঘরসংসার করারই কথা বলিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি হিব্রু ধর্মগ্রন্থের উপদেশ পালন করার কথাই বলিয়াছেন; কয়েক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "Haven't you read this scripture? 'In the beginning the Creator made them male and female, and said, "for this reason a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one' ", (Mathew, 19/4-5)[১]—আপনারা কী ধর্মগ্রন্থের এই নির্দেশটি পড়েন নি? 'আদিতে স্রষ্টা পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "এই কারণে পুরুষ পিতাকে ও মাতাকে ত্যাগ করিবে এবং পত্নীর সহিত মিলিত হইবে, উভয়ে এক হইবে।" ' তবে, তাঁহার শিষ্য হইতে হইলে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, সব ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে, যিশু একথাও বলিয়াছেন অর্থোপার্জন বিষয়ে যিশু বিরূপ; তিনি বলেন, you cannot have both God and wealth as your master. ...Do not be worried about the food and drink you need to stay alive or about clothes for your body.... Do not worry about to-morrow." (Mathew, 6/24-34)[২]— ঈশ্বর ও ধনসম্পদ্ এই উভয়কে নিজের প্রভু করা চলে না; বাঁচবার জন্য আহার্য্য-পাণীয় কিংবা আচ্ছাদনের জন্য বসনের চিন্তা কোরো না; আগামীকাল নিয়ে চিন্তা কোরো না। পরবর্তীকালের দুই-একটি খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থে বিবাহ সম্পর্কে ভিন্ন অভিমতও আছে, ঋষি পলের মতে, A man does well not to marry (1.Cor.7.1)— বিবাহ না করাই ভালো।

রামকৃষ্ণ প্রদত্ত কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ সম্পর্কিত উপদেশও পূর্বালোচিত "ঈশ্বর বস্তু, আর সব অবস্তু", "ঈশ্বরকে দেখা যায়", এই দুইটি উক্তির সহিত সমসূত্রে গ্রথিত। এই উপদেশটির ভিত্তিও ভেদবুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মধ্যে ঈশ্বর নাই, এই ধারণা। প্রকৃত সত্য এই যে, কামিনীও ঈশ্বর, কাঞ্চনও ঈশ্বর, কামিনীকাঞ্চন বর্জন করবার অর্থ এক দিক্ দিয়া ঈশ্বর বর্জন করা, কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার চেষ্টা যেন জল না খাইয়া বারি পান করিবার চেষ্টা।

১ New Testament, To-day's English Version, হইতে উদ্ধৃতি
২ ঐ

প্রাচীন ভারতীয় আর্য গ্রন্থসমূহে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা কুত্রাপি নাই। বেদের স্তোত্রগুলিতে সাংসারিক ইষ্টলাভের জন্য এবং বীর্যলাভের জন্য অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি কয়েকটি দেবতার নিকট প্রার্থনা জানানো হইয়াছে। উপনিষৎগুলিতে সর্বত্র জগতের স্বরূপ লইয়া উক্তি— আলোচনা আছে, কোথাও কামিনীকাঞ্চন বর্জন করিতে বলা হয় নাই। বরঞ্চ, বৃহদারণ্যকে স্ত্রীর সহিত যৌনসঙ্গম করা লইয়া বিস্তৃত পরামর্শ দেওয়া আছে। (৬।৪ দ্রষ্টব্য)। ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ" (২।১৩।২), কোনও কামার্থিনীকেই নিরাশ করা উচিত নয়। ঈশে সংযত হইয়া ভোগ করিবার কথা আছে, ভোগ বর্জন নয়, সংযত হইয়া ভোগ— ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, তেন ত্যক্তেন তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ (১), জগৎ ঈশ্বরময় জাগতিক দ্রব্য সংযমের সহিত ভোগ করুন, অপর কাহারও ধনের প্রতি লোভ করিবেন না। আত্মসংযমের সহিত ভোগ করার পরামর্শ, অতিরিক্ত গৃধ্নু না হইয়া ভোগ করিবার উপদেশ। বিধি, আচরণ, নীতি সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ মানবধর্মশাস্ত্রে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ নাই, ইহাতে মানুষের চারিটি আশ্রমের অর্থাৎ জীবন-ধারার মধ্য দিয়া যাইবার কথা বলা হইয়ছে— প্রথম জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া অধ্যয়ন, তৎপরে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবন-যাপন ও পুত্র জন্ম দান, তদনন্তর বনে বাস, এবং অবশেষে পরিব্রজন। চতুর্থমায়ুষো ভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজ দ্বিতীয়মায়ুষে ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবদ্বি-জিতেন্দ্রিয়ঃ, গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ, সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্ পুত্রেষু ভার্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা, অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নি-পরিচ্ছদম্ গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ, স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতানুকম্পকঃ, বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ চতুর্থং আয়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ। (৪।১, ৬।১, ২, ৩, ৪, ৮, ৩৩)। এই চারি আশ্রমের মধ্যে দ্বিতীয় আশ্রম, গৃহাশ্রমকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, এবং ইহার কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, গৃহী কর্তৃক বিদ্যাদান, অন্নদানাদি দ্বারাই অপর তিন আশ্রমের মানুষ বাঁচিয়া থাকেন — যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য

বর্তন্তে সর্বজন্তবঃ, তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ; যস্মাৎ ত্রয়োঽ-প্যাশ্রমিণো জ্ঞানেন চান্নেন চান্বহম্ গৃহস্থৈরেব ধার্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী (৩।৭৭-৭৮)— যেরূপ বায়ু থাকায় জন্তু থাকিতে পারে, সেইরূপ গৃহস্থ থাকায় অপর তিন আশ্রমিগণ থাকিতে পারেন। এবং দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, পুত্রোৎপাদন না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে অধোগতি হয়— অনধীত্য দ্বিজো বেদান্, অনুৎপাদ্য তথা সুতান্ অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষম্ ইচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ (৬।৩৭)—বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, পুত্র উৎপাদন না করিয়া, যজ্ঞ না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছা করিলে অধঃপাত হয়। এই সঙ্গে অপর একটি কথাও বলা হইয়াছে, আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বি-চ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ (৪।১৩৭) মৃত্যুকাল পর্যন্ত অন্বেষণ শ্রী করিবেন, শ্রী দুর্লভ মনে করিবেন না। কেবল একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্বীকার করা হইয়াছে— কেহ যদি শিক্ষাগুরুর গৃহে নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত সযত্নে গুরুসেবা করা কর্তব্য, যদি ত্বাত্যন্তিকং বাসং রোচয়েত গুরোঃ কুলে যুক্তঃ পরিচরে দেনমাশরীর বিমোক্ষণাৎ (২।২৪৩)। এটি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ব্যতিক্রম।

মহাভারতে, কুরুপাণ্ডব সমরের প্রাক্কালে, বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনকে যে-পরামর্শ দিয়াছেন, যে কৃষ্ণার্জুন সংবাদ ভগবদ্গীতা নামে পরবর্তী-কালে হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থরূপে আসন পাইয়াছে, সেই বিস্তারিত উপদেশাবলিতে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথা তো বিন্দুমাত্র নাইই, বরঞ্চ পূর্ণমাত্রায় ভোগের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে— তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব, রাজ্যং সমৃদ্ধম্ (মহাভারত ৬।৩৫।৩৩), শত্রু জয় করো, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করো। গীতার মূল বক্তব্য ত্যাগ নয়, ভোগ।

পরবর্তীকালে ভারতীয় আর্যদিগের আচরণে ও চিন্তাধারায় আলস্য-বাদ প্রবেশ করে। এই আলস্যবাদের অন্যতম রূপ আজগর ব্রত। কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরের অবসানের বহু বৎসর পরে রচিত ভাগবতে আজগর ব্রত অবলম্বনের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে অগ্রগণ্য বর্ষপতি ঋষভের নাম, যাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের নাম অনুসারে অজনাভ নামক বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইল। (৫।৪।৯)। অজনাভ বর্ষের বর্ষপতি ঋষভ জ্যেষ্ঠ-পুত্র ভরতকে অজনাভ বর্ষে শাসনকার্যে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মাবর্ত পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে আজগর ব্রত অবলম্বন

করিলেন। (৫।৫।২৮-৩২)। তিনি শয়নে এবাশ্নাতি পিবতি খাদত্যবমেহতি হদতি স্ম (৫।৫।৩২), শুইয়া শুইয়া আহার পান মল-মূত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর একজন আজগর ব্রতাবলম্বী পুরুষ যাঁহার সম্পর্কে গ্রন্থখানিতে বিশেষ উল্লেখ আছে তিনি জনৈক মুনি ; তিনি রাজা প্রহ্লাদের নিকট নিজ আচরণের কথা বলিলেন। অনীহঃ পরিতুষ্টাত্মা যদৃচ্ছোপনতাদহম্, নো চেচ্ছয়ে বহ্বহানি মহাহিরিব সত্ত্ববান্ (৭।১৩।৩৭), যা' আসে, তা'তেই আমি সন্তুষ্ট, অধিক চাই না. না আসিলে দিনের পরে দিন শুয়ে থাকি, মহা সর্পের মতো ; ইঁহার আচরণকে গ্রন্থপ্রণেতা নারদ নামক চরিত্রের মুখে পরমহংসের ধর্ম (ধর্মং পারমহংস্যং শ্রুত্বা ৪।১৩।৪৬) বলিলেন।

রাজা প্রহ্লাদের সহিত আজগর মুনির সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের কাহিনীটি অবশ্য বর্ষপতি ঋষভের কালের বহু পূর্বের ঘটনা। এটির উল্লেখ মহাভারতেও আছে, শান্তি পর্বে। মহাভারতের ভাষায় মুনিটির উক্তি, সুমহান্তমপি গ্রাসং গ্রসেল্লব্ধং যদৃচ্ছয়া, শয়ে পুনরভুঞ্জানো দিবসানি বহূন্যপি (১৭৯।১৯), যদি মিলে যায়, তো, ভূরি ভোজনই করলাম, আবার, কিছু না মিললে, দিনের পর দিন না খেয়েই শুয়ে রইলাম। আজগর ব্রত নিশ্চেষ্টতার চরম।

কামিনীকাঞ্চন বর্জন ভাবটি দুইটি পৃথক্ ভাবের সমষ্টি— কামিনী বর্জন এবং কাঞ্চন বর্জন। কামিনী বর্জন, যাহার তাৎপর্য নারীর সহিত যৌন সংসর্গ না করণ। কথাটি স্পষ্টতঃই কেবল পুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই উপদেশ একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। যদি নারীর সহিত যৌন সংসর্গ বর্জন করা পুরুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়, তবে পুরুষের সহিত যৌন সংসর্গ বর্জন করা নারীর পক্ষেও বাঞ্ছনীয়। মূল কথা যৌন ক্রিয়া বর্জন। একথা স্বীকার্য যে, একদিকে অত্যধিক যৌনক্রিয়ায় অত্যধিক রেতঃপাতের ফলে পুরুষের দৈহিক স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে, এবং অপর দিকে পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণের ফলে নারীর দৈহিক স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। এই অপরিমিত যৌনক্রিয়া বিবাহিত নরের ও বিবাহিত নারীর ক্ষেত্রেই অধিক সম্ভব। বিবাহের বাহিরে যৌনক্রিয়া নানা কারণে সীমিতই থাকে। বিবাহ যে এইভাবে কেবল দৈহিকহানি করে তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে ইহা মানসিক হানিও করে, মানসিক অশান্তি আনে। বিবাহ একটি বন্ধন,

এবং বন্ধন সময়ে সময়ে দুঃসহ মনে হয়, বন্ধনের বিরুদ্ধে কি পুরুষের, কি নারীর, মন বিদ্রোহ করে। মানুষের মন স্বাধীনতা চায়, বৈচিত্র্য চায়, একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে থাকিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। এই দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে বিবাহ সম্পর্কে সতর্কতা কি পুরুষের, কি নারীর, উভয়েরই প্রয়োজন। মানবজীবনে দুইটি প্রধান কাম্য, প্রথমতঃ দৈহিক সুস্থতা, দ্বিতীয়তঃ মানসিক শান্তি। এই দুইটির বিঘ্নকারী অবস্থাকে কি পুরুষের, কি নারীর, পরিহার করা উচিত।

কাঞ্চনবর্জনের প্রশ্নে পূর্বালোচিত আজগর ব্রতের কথা আসে। কাঞ্চন শব্দটির প্রাসঙ্গিক অর্থ ধনসম্পত্তি। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া বর্তমান জগতে জীবনধারণ প্রায় অসম্ভব। অনাহারে আত্মহত্যা করিব, এইরূপ সঙ্কল্প না করিলে কেহ এখন আজগর ব্রতের পথে পা বাড়াইতে পারেন না।

রামকৃষ্ণ নিজেও কাঞ্চন বর্জন করেন নাই। তিনি সাধারণ গৃহীর মতোই গৃহে থাকিতেন, এবং আজগর ব্রত অবলম্বন করা তো দূরের কথা কোনও দিন গৃহত্যাগও করেন নাই। তাঁহার প্রয়োজনীয় অর্থ যে ব্যক্তিরা জোগাইতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অবাঞ্ছনীয় উপায়েই অর্থোপার্জন করিতেন। দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকেরাই অনেক সময়ে পরলোক ভয়ে পাল্লা ঠিক রাখিবার জন্য সাধু ভক্ত হন, এবং রামকৃষ্ণের ভক্ত রসদদারদের মধ্যে এ জাতীয় লোকও ছিলেন।

রামকৃষ্ণ নিজেও মনে মনে বুঝিতেন যে, যদিও স্ত্রীসংসর্গ না করিয়া থাকা সম্ভব, তথাপি টাকা পয়সা ভিন্ন একেবারেই চলে না। একথা তিনি ভক্তগণের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটি টাকা, টাকাই মাটি' এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ ক'রে দেন, তা হ'লে কি হবে? তখন হাজরার মতো পাটোয়ারি করলুম, বললুম, মা, তুমি যেন হৃদয়ে থেকো।" অন্য একদিন বলিলেন, "সাধুদের টাকা পয়সা দেবে না তো খাবে কি ক'রে?" ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে একদিন ভক্তদের নিকট বলিলেন, "হৃদে আমার অনেক করেছিল, এখন সে কিছু পেলে আমার মনটা স্থির হয়; কিন্তু কোন বাবুকে বলতে যাব, কে ব'লে বেড়ায়?"

রামকৃষ্ণ মনে মনে বুঝিতেন যে, টাকা ঠিক মাটি নয়, মাটিও টাকা

নয় : টাকাকে মাটি বলা চলে কেবল সেই অর্থে যে-অর্থে আকাশের নীলিমা দিয়া কাপড় ছোপানো যায়।

কৃষ্ণদাস পাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। রামকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য কি?" কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমার মতে, জগতের উপকার করা, দুঃখ দূর করা।" রামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার ওরূপ রাঁড়ীপুতী বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখ নাশ তুমি করবে? ...এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা এই জীবনের উদ্দেশ্য।" এবং পরে, কৃষ্ণদাসের অসাক্ষাতে ভক্তদের নিকট বলিলেন, "কৃষ্ণদাস পালের ভিতরে কিছু নাই।" জনৈক ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন স্কুল মীটিং প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত থাকায় কয়েকদিন রামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই জানিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন, "মীটিং ইস্কুল আফিস এ সব অনিত্য; সব মন দিয়ে ঈশ্বরকেই আরাধনা করা উচিত।"

মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে নিজের মত আরও স্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত করিয়া রামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। কর্ম তো আদিকাণ্ড; জীবনের উদ্দেশ্য হোতে পারে না। তবে নিষ্কাম কর্ম একটি উপায়— উদ্দেশ্য নয়। শম্ভু বললে, 'এখন এই আশীর্বাদ করুন যে, যা' টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়— হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা, রাস্তাঘাট করা, কূয়ো করা, এই সবে।' আমি বললুম, 'এসব কর্ম অনাসক্ত হোয়ে করতে পারলে ভালো; কিন্তু তা' বড়ো কঠিন। আর যা-ই হোক, এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি করা নয়। মনে করো, ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন; এসে বললেন, তুমি বর লও; তা' হোলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি কোরে দাও, বলবে, হে ভগবান্, তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই।' হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি এসব অনিত্য বস্তু। তাঁকে লাভ হোলে আবার বোধ হয়, তিনিই কর্তা, আমি অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হোলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল ডিস্পেন্সারি হোতে পারে।"

গামছা কাঁধে ফেলিয়া 'গামছা, গামছা' করিয়া খোঁজা যেরূপ, জলে ডুব দিয়া 'জল কই' বলিয়া চক্ষের জল ফেলা যেরূপ, রামকৃষ্ণের ভাবও সেইরূপ। তিনি ঈশ্বরকে আলাদা করিয়া টাটে বসাইয়া রাখিতে চান, তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের কালীঘরে আবদ্ধ কালী প্রতিমার মতো— মানুষকে যেন সেই প্রতিমার চরণ ছুঁইবার চেষ্টা করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ যে প্রকৃত সত্য অদ্বৈতবাদ জানিতেন না, তাহা নহে— কদাচিৎ ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন, "তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন" —কিন্তু এই সত্য যেন তাঁহার মর্মে প্রবেশ করে নাই। তিনি মনের এক কোণে মনোমত করুণাময় ঈশ্বরকে রচনা করিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রয়াস হইয়াছে সেই রচিত ঈশ্বরকে পাইবার।

ভিতরে বাহিরে সর্বত্রই যেক্ষেত্রে ঈশ্বর, সেক্ষেত্রে ঈশ্বরলাভের জন্য চেষ্টা অর্থহীন। ঈশ্বর যদি মানুষ হইতে ভিন্ন হন, তবেই মানুষের পক্ষে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা সার্থক ; কিন্তু যেক্ষেত্রে মানুষ তাঁহারই প্রকাশ, সেক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরলাভ করার চেষ্টার অর্থ কোথায়? মানুষ তাঁহাকে সব সময়েই পাইতেছে এবং কোনও সময়েই পাইতে পারে না —সব সময়েই পাইতেছে, কারণ, তিনিই যে, কোনও সময়েই পাইতে পারে না, কারণ, আলাদা করিয়া পাইবার উপায় নাই। রামকৃষ্ণ কর্তৃক ঈশ্বরকে পাইবার প্রয়াস আকাশ মুষ্টিবদ্ধ করিবার প্রয়াস।

ঈশ্বরলাভের প্রয়াস যে কেবল অর্থহীন ব্যর্থপ্রয়াস তাহা নহে, এ প্রয়াস দোষাবহও বটে। গাছে ফুল ফুটিয়াছে— গাছটি ফুলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— এক্ষেত্রে ফুলের কাজ কি "গাছ কই, গাছ কই" বলিয়া মুখ ছেচড়াইয়া কাঁদা, না, নিজকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিবার চেষ্টা করা? মেঘ হইতে জল পড়িতেছে— মেঘই জল— এ-ক্ষেত্রে জলবিন্দুর কাজ হইবে কি "মেঘ কই, মেঘ কই" বলিয়া অস্থির হওয়া, না, পৃথিবীকে সিক্ত করা? সূর্য হইতে কিরণ ছড়াইয়া পড়িতেছে —সূর্যই কিরণ— কিরণের কাজ হইবে কি সূর্যের দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করা, না, ছুটিয়া আসা জগৎ আলোকিত করিবার জন্য?

ঈশ্বরের সহিত মানুষের সম্পর্কও সেইরূপ। এক অদ্বিতীয়ই মানুষরূপে প্রতীত সোংকামত (বৃহদারণ্যক ১।২।৪), সেই অদ্বিতীয়ের কামনাতেই। মানুষের কাজ, "ভগবান্ কই, ভগবান্ কই" বলিয়া অশ্রুপাত করা নয়, হাতড়াইয়া বেড়ানো নয়, কাজ নিজের মনুষ্যত্ব ফোটাইয়া তোলা,

কূর্মের মতো হাত পা ভিতরে গুটাইয়া লওয়া নয়, অ্যামিবার মতো ছড়াইয়া পড়া।

প্রচেষ্টাই মানব-জীবনে সার। সাধারণ মানুষের ভাষায় সন্তোষকে সুখের মূল বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সন্তোষ ব্যক্তিগত জীবনে মানসিক অশান্তির প্রতিষেধকের কাজ ক্ষেত্রবিশেষে করিয়া থাকে মাত্র। অপর পক্ষে, অসন্তোষ উন্নতির মূল এবং পরিণামে সুখ-শান্তির মূল। মানবজাতির যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার মূলে ছিল অসন্তোষ, কর্মপ্রচেষ্টা। আদিম মানুষ যদি নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট না হইতেন, যাহা আছে তাহাই ভালো এই বিবেচনায় দিন কাটাইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের লালপেড়ে ধুতি, বার্নিশ-করা কালো চটি জুতা, বিছানা, মশারি, খাট, এসব কিছুই হইত না, তিনি যে ঘরে বাস করিতেন তাহাও নির্মিত হইত না, তাঁহাকে গিরিগুহায় দিন কাটাইতে হইত ; কেবল তাহাই নহে, তাঁহার ভক্তও জুটিতেন না, কারণ, প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই ফল মূল আহরণ করিয়া পশু-পক্ষী মারিয়া নিজের নিজের আহার্যসংস্থানে ব্যস্ত থাকিতে হইত, অবসর মিলিত না। এই সার কথা ভারতীয় আর্যগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ, এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি, ন কর্ম লিখ্যতে নরে (ঈশ ২)। অর্থাৎ কর্ম করিতে করিতে চলিয়া শত বৎসরের পরমায়ু আকাঙ্ক্ষা করুন, ইহা ভিন্ন আপনার অন্য পথ নাই, কর্ম মানুষের গায়ে লাগিয়া থাকে না— কর্ম করিয়া চলুন, কর্মময় দীর্ঘ জীবন কামনা করুন, ইহাই মানুষের এক-মাত্র চলার পথ, এ-বিষয়ে মৃত্যুর পরে কি হইবে সে-চিন্তা অবাস্তব। মানব ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ, শ্রদ্ধয়েষ্টঞ্চ পূর্তঞ্চ নিত্যং কুর্যাদতন্দ্রিতঃ (৪।২২৬), নিরন্তর আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত যজ্ঞাদি ও কূপ খননাদি কর্ম করা কর্তব্য। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে প্রদত্ত উপদেশাবলিতে জলাশয় খনন ও বৃক্ষরোপণের কথা বিশেষভাবে বলা আছে— তড়াগ-কৃদ্ বৃক্ষরোপী ইষ্টযজ্ঞশ্চ যো দ্বিজঃ, এতে স্বর্গে মহীয়ন্তে, যে চান্যে সত্য-বাদিনঃ ; তস্মাৎ তড়াগং কুর্বীত আরামাংশ্চৈবরোপয়েৎ যজেচ্চ বিবি-ধৈর্যজ্ঞৈঃ সত্যং চ সততং বদেৎ, (৫৮।৩২-৩৩)। প্রাচীন জ্ঞানিগণ জানিতেন যে, ধ্যানসিদ্ধ নিষ্ক্রিয় ব্রাহ্মণ জাজলি অপেক্ষা সৎপথচারী

গৃহস্থ বৈশ্য বণিক তুলাধার উন্নত— দৈব ইচ্ছায় জাজলিকে অবনত-মস্তকে তুলাধারের মুখে ধর্মাচরণ সম্পর্কে বিস্তৃত উপদেশ শুনিতে হইল—বহু কথার মধ্যে তুলাধার বলিলেন, "সর্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ কর্মণা মনসা বাচা, স ধর্মং বেদ, জাজলে, (মহাভারত, শান্তি-পর্ব, ২৬২।৯)।" যে-মানুষ কায়মনোবাক্যে সকলের সুহৃৎ, সকলের হিত-সাধন করেন, তিনি ধর্মজ্ঞ।

লোকহিতকর কর্ম-- ইহাই মানুষের প্রধান করণীয়, মানব-জীবনের সার। এই সত্য কৃষ্ণদাস পাল বুঝিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বুঝিয়া-ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ বোঝেন নাই। এবং বোঝেন নাই বলিয়াই রাম-কৃষ্ণ লোকের কাছে বলিতেন, "কৃষ্ণদাস পালের ভিতরে কিছু নাই, বিদ্যাসাগর অন্তর্দৃষ্টিহীন।" রামকৃষ্ণের ন্যায় নামসম্বল সাধুদিগের সম্পর্কেই উক্তি আছে— অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণ কৃষ্ণেতিবাদিনঃ তে হরের্দ্বেষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ, নিজের কর্তব্য কর্ম বর্জন করিয়া যাঁহারা "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া দিন কাটান, তাঁহারা হরিদ্বেষী পাপী।

স্বয়ং বাসুদেব কৃষ্ণের বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্‌কালে তিনি অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, নিয়তং কুরু কর্ম ত্বম্ (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২৭।৮), নিরন্তর কর্ম করো। যাঁহারা বাসুদেব কৃষ্ণকে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ (ভাগবত ১।৩।২৮)— কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের নিকট রামকৃষ্ণের উক্তি ও আচরণ নিন্দাই হওয়া সঙ্গত।

ঈশ্বর কোনও মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর দিতে চাহিলে রামকৃষ্ণের মতে সেই মানুষ বলিবে, "তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই।" রামকৃষ্ণের এ ধারণা ভুল। ঐ অবস্থায় মানুষের কণ্ঠ উদ্বেল হইয়া উঠিবে অন্য ধারায়। এ জীবনে মানুষ অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ, ক্ষোভ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। মানুষ বরঞ্চ বলিবে—

"হে ভগবান, এ কি তোমার রাজ্য! এখানে দেখছি নিয়ত চলছে সংগ্রাম, একে অপরকে গ্রাস কোরে নিজের করছে পুষ্টি, একে অপরকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিজের কোরে নিচ্ছে স্থান। পীড়িতের আর্তনাদে

জগৎ থেকে উঠছে "উঃ" এই যন্ত্রণাবোধাত্মক নাদ। চতুর্দিকে সংহার ও হাহাকার, উৎপীড়ন ও প্রতারণা।

"কত কিসা-গোতমী মৃত শিশুপুত্র কোলে কোরে উন্মাদিনীর মতো রোদন করে। চীৎকারে আকাশের বুক ফেটে যায়, তোমার কী বুক ফাটে না? ব্যাধিতে, দুর্ভিক্ষে, দুর্ঘটনায়, যুদ্ধে, প্রতিনিয়ত মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে, বিপদে দুঃখে শোকে তোমার পদারবিন্দে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছে— তোমার কি মায়া হয় না? যুগ যুগ ধোরে মানুষ যে নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকুল আবেদন জানিয়েছে, তা' একত্র করলে বুঝি বা আকাশ পূর্ণ হোয়ে যায়— তোমার হৃদয় কী স্পর্শ করে নি। স্পর্শ করে নি কি আর্তের আকুল আর্তনাদ Eloi, Eloi, lama sabachthani, ভগবান্, ভগবান্ কেন আমায় ত্যাগ করলে? (Mark, 15।34)।

"কেবল মানবজগতে নয়, সমগ্র জীবজগতেই আর্তনাদ। অসহায় মৃগশিশুকে ক্ষুধার্ত শ্বাপদ সংহার কোরে উদরস্থ করছে; এই কি তোমার বাঞ্ছিত? ফুলের মতো সুন্দর প্রজাপতিগুলি সরীসৃপের উদরস্থ হচ্ছে; এই কি তোমার ইচ্ছা? তুমি কি অন্ধ? তুমি কি বধির? তুমি কি হৃদয়হীন?

"অথবা তোমার কোনও শত্রু, কোনও দানব আছে, যে তোমার সদুদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ করছে? কোনও শয়তান? যে আনছে সংগ্রাম যেখানে তুমি চাও শান্তি, যে আনছে হিংসা যেখানে তুমি চাও প্রীতি, যে আনছে দুর্বলতা যেখানে তুমি চাও শক্তি, যে আনছে কদর্যতা যেখানে তুমি চাও সৌন্দর্য, যে আনছে মিথ্যা যেখানে তুমি চাও সত্য? তা' যদি হয়, তবে তোমার সর্বশক্তিমত্তা কোথায়? তাহোলে কি তুমি মানুষের মতোই অসহায়? না, তুমি নীরব নিশ্চল দর্শক হোয়ে দেখছো, শুনছো, জানছো, কিন্তু হস্তক্ষেপ করছো না, ভাবছো পরজন্মে এর ব্যবস্থা করবে এই স্থির কোরে? সে কথা যদি সত্য হয়, তা'হোলে তো তুমি নিবারণ করতে সমর্থ থেকেও নিবারণ করলে না, পরে দণ্ড দেবার জন্য তুলে রাখলে? এটা কি ঈশ্বরোচিত কাজ? না, না, এসব কল্পনীয় নয়। এক ভিন্ন দুই নাই। তুমিই সব, তোমার ইচ্ছাই সব। তুমিই দেব, তুমিই দানব, তুমিই শিব, তুমিই রুদ্র, তুমিই স্রষ্টা, তুমিই হন্তা। তোমার সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা হিংসার বেদীতে, তোমার পদক্ষেপ ধ্বংসের ভস্মস্তূপের উপরে। তুমিই জীবকে অনুভব শক্তি দিয়েছ, তুমিই আনন্দ-

যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটিয়েছ। তুমি সর্বশক্তিমান্, তুমি যথেচ্ছাচারী।

"হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি, বা কিছুই তোমার কাছে চাই না। তোমার ইচ্ছা হোলে তো এসবের প্রয়োজনই হতো না— ব্যাধি থাকতো না, কোনও অভাবই থাকতো না। তোমার ইচ্ছা সেরূপ নয়। তোমার ইচ্ছা জীবজগতে দুঃখ কষ্ট থাক, তাই, জীবজগতে দুঃখ কষ্ট আছে। তোমার ইচ্ছা মানুষ রোদন করুক, তা'ই, মানুষ রোদন করে। আদিকাল থেকে তোমার অনুসৃত পথের পরিবর্তন ঘটে নি, আমার পূজার্চনায়, আমার প্রার্থনায়, আমার ধ্যানে সে-পথের পরিবর্তন ঘটবে না। তোমার কাছে পূজা, অর্চনা, প্রার্থনা, ধ্যান, সবই নিষ্ফল। তোমার প্রতি মানুষের মনে ভীতি আসে, ভক্তি আসে না, আসা সম্ভব নয়।"

রামকৃষ্ণ বলিতেন, "আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা··· যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আলাদা আর খোল আলাদা হোয়ে যায়। আত্মাটি যেন দেহের ভিতর নড়নড় করে।" বলা বাহুল্য, এই উক্তিটি বহুবাদাত্মক এবং ভ্রান্ত। মানুষের দেহও পরমাত্মার জ্যোতি, মানুষের চৈতন্যও পরমাত্মার জ্যোতি। ভাগ করা সম্ভব নয়। রামকৃষ্ণ যে দ্বৈতবাদই সার বুঝিতেন, এই উক্তি তাহাই প্রমাণ করে।

রামকৃষ্ণের মতে, "বিচারের দরকার নাই ; বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক ; আম খেতে এয়েছো, আম খাও ; কত গাছ, কত ডাল, কত পাতা, এসবের হিসাবের দরকার নাই" ; বলিতেন, "বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।" "বালকের মতো বিশ্বাস চাই।"

এই অভিমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বিচারবুদ্ধি বিধাতৃ-প্রদত্ত অমূল্য সম্পৎ, বিচারবুদ্ধিই মানুষকে মনুষ্যপদবাচ্য করে। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ পদে পদে প্রয়োজন। সত্যবিশ্বাসের উদয় হয় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ফলেই, বিচারবুদ্ধি বর্জন করিয়া নহে। বিচারবুদ্ধি বর্জন করিলে মিথ্যা ভ্রান্ত বিশ্বাসই মনে আসে। বুদ্ধিমান্ মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি লক্ষ করিয়া চিন্তা বিবেচনা করিতে থাকেন, এবং অবশেষে উপলব্ধি করেন যে, মানুষ অপেক্ষা শক্তিশালী অপর কেহ আছেন। ইহার ফলে মানুষের মনে প্রাকৃতিক বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে, বিভিন্ন শক্তির মধ্যে, দেবতার অস্তিত্বের কল্পনা আসে। এই ভাবে পাথর-দেবতা, মাটি-দেবতা, জল-দেবতা, বায়ু-দেবতা, অগ্নি-দেবতা প্রভৃতি দেবতা

মানুষের মনে জন্মায়। মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা-উপাসনা এই স্তরের অবস্থা। কিছু মানুষ চিন্তাধারার উন্নততর স্তরে উঠিয়া উপলব্ধি করেন যে, সকল শক্তির উৎস এক, মাটি, পাথর প্রভৃতিতে দেবতা নাই, জগতে একজন ঈশ্বর, তিনি সর্বশক্তিশালী, দৃষ্টির অগোচর স্বতন্ত্র। অতি-চিন্তাক্ষম মানুষ অবশ্য প্রথম স্তরে না আসিয়া সরাসরি দ্বিতীয় স্তরে আসিতে পারেন। অপরপক্ষে, সাধারণ ক্ষীণ বুদ্ধি মানুষ কখনও দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছিতে পারেন না। এই উভয় স্তরের চিন্তাধারাই পার্থক্য-ভিত্তিক, বিচ্ছিন্নতাভিত্তিক। দ্বিতীয়স্তরীয় বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন, ঈশ্বর পরমাত্মা, পৃথক্ পৃথক্ মানুষে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, প্রত্যগাত্মা বিদ্যমান-- কেহ বা প্রত্যেকটি জীবেরই এক একটি পৃথক্ আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন– দেহীর মৃত্যুর পরে প্রত্য-গাত্মাটি পরলোকে যায় ; ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যগাত্মাটি অন্য একটি দেহে প্রবেশ করে – তদ্ যথা তৃণ জলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি এবম্ এব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নির্হত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৩), ঘাসে জোঁকের মতো দেহীর আত্মা এক দেহ ধরিয়া পূর্ব দেহ ছাড়ে। এই মতবাদে বিশ্বাসী অন্যতম ব্যক্তি দীর্ঘজীবী মুনি মার্কণ্ডেয়। মহাভারতের কাহিনীতে তাঁহার সহিত বনবাসী যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে মার্কণ্ডেয় বলিতেছেন, "আয়ুষোঽন্তে প্রহায়েদং ক্ষীণপ্রায়ং কলেবরং সম্ভবত্যেব যুগপদ্ যোনৌ না স্ত্যন্তরাভবঃ, (বনপর্ব, ১৮৩।৭৭)।" এই বাদাশ্রয়ি-গণের অধিকাংশ মনে করেন যে পাপ ও পুণ্য আছে, স্বর্গ ও নরক আছে, পরলোকে গিয়া কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে হয়, পাপকর্ম করিলে মৃত্যুর পরে নরকবাস, পুণ্যকর্ম করিলে মৃত্যুর পরে স্বর্গবাস, ঈশ্বর জীবের বিচার করেন, মৃত্যুর পরে বিচার হয়। পূর্বোল্লিখিত মুনি মার্কণ্ডেয় পরলোকে গিয়া ইহলোকে কৃতকর্মের ফলভোগ করিতে হয়, তাঁহার এই মতবাদের কথাও যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "তত্রাস্য স্বকৃতং কর্ম ছায়েবানুগতংসদা ফলত্যথ সুখার্হো বা দুঃখার্হো বা থ জায়তে, (বনপর্ব, ১৮৩।৭৮)।" এই শ্রেণীর কাহারও কাহারও মতে অতিপুণ্য-বানেরা জন্ম চক্র হইতে মুক্ত হন, তাঁহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই শ্রেণীর বিশ্বাসিগণের অধিকাংশই ঈশ্বরকে করুণাময়

বলেন, মনে করেন যে, তিনি ক্ষমা করেন, সহজেই তুষ্ট হন। ইঁহারা ভক্তিবাদী, ভগবদ্ভক্ত। কচিৎ বা কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর নির্দয়, অথবা তিনি মানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর করুণাময় বটেন, কিন্তু তাঁহার একজন দুষ্ট পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, পৃথক্ ঈশ্বর বিশ্বাসিগণের ঈশ্বর মানুষের ছাঁচে তৈয়ারি, অতিকায় মানুষ, তাঁহাদের ঈশ্বরের গুণাবলি মানুষের গুণাবলির বিরাট সংস্করণ। প্রচলিত যাবতীয় ধর্মবিশ্বাস, যেমন প্রচলিত হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি, ঈশ্বরে মানুষে পার্থক্যমূলক, ভক্তিমূলক, পূজা-উপাসনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, ঐ সকল ধর্মবিশ্বাসের মূল ঈশ্বরকে পৃথক্ জ্ঞান, পৃথক্ জ্ঞানে ঈশ্বরকে স্মরণ— কেহ সাকার প্রতিমার উপাসনা করেন, কেহ নিরাকার উপাসনা করেন। ইঁহাদের মূল কথা, তুমি আছ, আমি আছি। আমি ও তুমি, এই বিচ্ছিন্নতাভাব।

চিন্তার চরম স্তরে যাঁহারা পৌঁছিয়াছেন তাঁহারা মনে করেন যে, সকলই ঈশ্বর, সকলই তাঁহার প্রকাশ, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, পৃথক্ জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা নাই, মনে করেন যে তিনিই একমাত্র কর্তা, তিনিই সব করিতেছেন, তাঁহাদের মতে পাপ নাই, পুণ্য নাই, পরলোক বলিয়া কিছু নাই, জন্মান্তর নাই, স্বর্গ বা নরক নাই, মানুষ কর্তা না হওয়ায় কর্মফলভোগের প্রশ্ন আসে না, পূজা-উপাসনা অর্থহীন— কে কাহার পূজা করিবে, কে কাহার উপাসনা করিবে?

উপরি-উক্ত সকল প্রকারের বিশ্বাসের মূলে আছে মানুষের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ। যেখানে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ নাই, সেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে কোনও কল্পনা, কোনও ধারণাও নাই। অতিশিশুর বা জড়-মস্তিষ্ক মানুষের ঈশ্বরবিষয়ক চিন্তা-ধারণা নাই। যাঁহারা মনে করেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাসে লভ্য, বিচারবুদ্ধিতে লভ্য নন, বা বলেন যে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহাদের ঈশ্বরসম্পর্কিত ধারণা যে তাঁহাদের নিজদের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত, ইহা তাঁহারা উপ-লব্ধি করেন না। তাঁহারা লক্ষ করেন না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসও বিচারের ফল, ঈশ্বরে ভক্তির ভিত্তিও বিচারবুদ্ধি, ভক্তিবাদও বিচার-বাদ, যুক্তি-বাদ। বিচারবুদ্ধি বর্জনের অর্থ মনুষ্যত্ব বর্জন, জড়ত্ব অর্জন।

মানুষের মনের মূলধারা অহমিকা। নিজের চিরস্থায়িত্ব ভাবিতে

ভালো লাগে। অহমিকা মরিতে চায় না, বহুবাদে আত্মগোপন করিয়া থাকে, লেব্‌লের অন্তরালে স্বরূপ ঢাকিতে চায়। সত্য একরূপী, এক-নামধারী, মিথ্যা বহুরূপী, বহুনামধারী। দেবদানবের সংগ্রাম, মিথ্যা বিশ্বাস দানবের সহিত যুক্তিলব্ধ সত্য দেবতার সংগ্রাম, মিথ্যা বিশ্বাস-প্রবণতার সহিত যুক্তিপ্রবণতার সংগ্রাম— অদ্বিতীয়ের ইচ্ছায় এই সংগ্রাম শাশ্বত, ইহার অবসান সম্ভব নয়।

রামকৃষ্ণের মনের মধ্যে বিচার আতঙ্ক। রামকৃষ্ণ অবশ্য অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব বুঝিতেন, কিন্তু আচরণে তিনি দ্বৈতবাদী, ভক্তিবাদী কালী-প্রতিমাকে ঐশী শক্তির প্রতীকরূপে ভক্তি করিতেন, এবং অদ্বৈতবাদের অবশ্যম্ভাবী অনুসিদ্ধান্তগুলি হইতে ভয়ে পিছাইয়া আসিতেন। অদ্বৈত-বাদী পুনর্জন্ম মানেন না— জীবের পৃথক্ আত্মা নাই, কাহার পুনর্জন্ম হইবে? রামকৃষ্ণ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন, এবং ভক্তগণের নিকট বলিতেন, "আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।" কাটোয়ার বৈষ্ণবের নিকট এ-বিষয়ে গীতার একটি কথা প্রমাণ বলিয়া খাড়া করিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবটি যেই একটু চাপিয়া ধরিলেন, অমনি রামকৃষ্ণ চটিয়া উঠিয়া নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, বলিলেন, "আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না, আবার মোলে কি হয়!" শ্যাম বসু একটি অতি-মৌলিক প্রশ্ন করিলেন, "ঈশ্বর সব করছেন, অথচ, পাপের শাস্তি আছে, এটি কী স্ববিরোধী উক্তি নয়?" বাস্তবিকই এটি স্ববিরোধী উক্তি। ইহাতে অদ্বৈতবাদের মুড়া ও দ্বৈতবাদের লেজা জোড়া দেওয়া হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর সব করিতেছেন; পাপ আছে, বা, পাপের শাস্তি আছে, একথা তিনি বলেন না। অপরপক্ষে, দ্বৈতবাদী বলেন যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, স্বাধীনভাবে কর্ম করার ক্ষমতা আছে, কৃতকর্মের ফলাফল মানুষকে পরলোকে বা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে। ঈশ্বর সব করিতেছেন এই কথা বলা এবং সেই সঙ্গে বলা যে পাপের শাস্তি আছে— এটি অজ্ঞতার চরম। অথচ রামকৃষ্ণ শ্যাম বসুর এই সঙ্গত প্রশ্নটি শুনিয়া রাগিয়া আগুন হইলেন। রামকৃষ্ণ অন্তরে দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈতবাদের যে বুলিগুলি শুনিয়া শিখিয়াছিলেন সেগুলিও ছাড়িতে পারেন না, ফলে একটি বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রশ্নটি এত মৌলিক যে ইহা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের মনে আসিতে পারে এবং অতীতে আসিয়াও ছিল। ভাগবত পুরাণে প্রশ্নটি দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের এক পুত্র বিদুরের মুখ দিয়া অপর এক পুত্র শুকের নিকট করা হইয়াছে। বিদুর বলিতেছেন, "ভগবানেক এবৈষ সর্বক্ষেত্রেষবস্থিতঃ, অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্মভিঃ কুতঃ ?" (৩।৭।৬)— এক ভগবান্ সর্বক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, এ অবস্থায় কর্মহেতু দুর্ভাগ্য বা ক্লেশ কি করিয়া হয়? উত্তরে শুক বলিলেন, সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে (৩।৭।৯), এই যুক্তিবিরুদ্ধ অবস্থা ভগবানের মায়া, যেমন, স্বপ্নে নিজকে ছিন্নশিরা দেখা, জলের মধ্যে চন্দ্রকে কম্পিত দেখা (৩।৭।১০-১১)।

বিচার না করিয়া বিশ্বাস করো, এই মত ভারতীয় আর্যঋষিদের মধ্যে ছিল না। উপনিষৎগুলি পড়িলে দেখা যায় যে, পদে পদে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে, কোথাও বলা হয় নাই, "বিচার করিও না, প্রশ্ন করিও না, বিশ্বাস করো।" উপনিষৎগুলির কাল হইতে এদিকে সরিয়া আসিয়া রামায়ণের যুগে, কি, আরও পরবর্তীকালে, মহাভারতের যুগে, এ-বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত— গুরুর কথাও নির্বিচারে মানিও না, গুরু ঠিক পথে চলিতেছেন কি না, নিজে বিচার করিয়া দেখ, গুরু ভ্রান্ত পথে চলিলে তাঁহাকে শাসন করো, তাঁহাকে ত্যাগ করো— গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যম জানতঃ উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্যং ভবতি শাসনম্ (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২১।১৩), গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যম জানতঃ উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ১৭৮।৪৮)। পরবর্তীকালে পরিবর্তন আসিয়াছে, উদার আর্য মনোভাবের উপরে তামসিক অবলেপন পড়িয়াছে, অন্ধবিশ্বাস বিচারের আসন গ্রহণ করিয়াছে। সোনা ছাই চাপা পড়িয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে, স্বীয় বিচারবুদ্ধিই সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে মানুষের নিজস্ব চাবি। এটি পরের হাতে তুলিয়া দিয়া পরের কথায় চলার অর্থ নিজের চক্ষু পরকে দেওয়া। বিচারবুদ্ধি ঐশী শক্তিরই প্রকাশ; বিচারবুদ্ধিকে অবমাননা করার অর্থ ঐশী শক্তিকে অবমাননা করা।

অন্ধবিশ্বাস যে কেবল ভুল, তাহা নহে, ইহা বিপজ্জনকও বটে। কাহার কথায় বিশ্বাস করিবেন? কে আপনা অপেক্ষা বেশি জানেন?

যাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন, তিনি যে আপনা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, ইহা স্থির করিতেও তো আপনার নিজেরই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ প্রয়োজন। বিশ্বাস করার ফলে অন্ধের দ্বারা নীত হইয়া গর্তে পড়িবার সম্ভাবনা— অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ (কঠ ১।২।৫, মুণ্ডক ১।২।৮)।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাশিক্ষার প্রতি বিরূপ ছিলেন। বলিতেন, "যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই বিদ্যা, আর সব মিছে।" সাধারণ বিদ্যাশিক্ষাকে তিনি অবিদ্যাশিক্ষা মনে করিতেন। পাঠে শশীর মনোযোগ লক্ষ করিয়া তাঁহার বিরক্তিপ্রকাশের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। জনৈক যুবক শাস্ত্র পড়েন শুনিয়া রামকৃষ্ণ বলিলেন, "বেশি পড়াতে আরও হানি হয়। শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার ? সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয় —ঈশ্বরলাভের জন্য।" প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলিলেন, "তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয়, তো, সবই জানতে পারবে।" বলরামের পিতাকে বলিলেন, "বই আর পোড়ো না।" সংবাদপত্র দেখিয়া সরাইয়া রাখিতে বলিলেন, অস্পৃশ্য বিবেচনায়।

বলা বাহুল্য, ঈশ্বরকে জানিলেই সব জানা হইয়া যায় না, বর্ণমালা চিনিলেই ভাষাজ্ঞান হয় না। ঈশ্বর-সর্বস্ব মানুষ বহু বিষয়ে অজ্ঞ হইতে পারেন। রামকৃষ্ণ স্বয়ং একাধিক বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় কেন, অধর সেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সীতাকুণ্ডে জলে আগুন জ্বলে কেন।

রামকৃষ্ণের এই জাতীয় উক্তি ও আচরণ প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের বিপরীত। ভারতীয় আদর্শে অধ্যয়ন অবশ্য করণীয়— অনধীত্য দ্বিজো বেদান্… মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ (মনু ৬।৩৭), বেদ অধ্যয়ন না করিয়া দ্বিজ যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তাঁহার অধঃপতন হইবে, ঋণবান্ জায়তে মর্ত্যঃ, তস্মাৎ অনৃণতাং ব্রজেৎ স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যঃ (মহাভারত, শান্তি-পর্ব, ২৯২।৯-১০), মানুষ ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, স্বাধ্যায়ে অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারা মহর্ষিগণের নিকট ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

রামকৃষ্ণের মতে, ঈশ্বর কাহাকেও বেশি শক্তি কাহাকেও কম শক্তি দিয়াছেন, ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠকখানা, এবং বিদ্যাসাগর এই সরল সত্যটি জানেন না বলিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের জ্ঞানের পরিধির প্রতি

কটাক্ষপাত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা, রামকৃষ্ণের নিজেরই ভুল। ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশে কম বেশি নাই, প্রত্যেকের ভিতরেই সেই একই মহাশক্তির প্রকাশ, প্রত্যেক মানুষই সেই একই শক্তিতে শক্তিমান্, প্রত্যেক জীবই সেই একই শক্তিতে শক্তিমান্, প্রত্যেক পদার্থই সেই একই শক্তিতে শক্তিমান্। ঐশী শক্তি মানুষের বুদ্ধি দিয়া কিংবা মনুষ্য নির্মিত কোনও পরিমাপক যন্ত্র দিয়া মাপিবার জিনিস নয়। ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের বৈঠকখানা, আর অভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের পায়খানা— এই পার্থক্যবোধ আসে ঐশী সত্তার স্বরূপ না বোঝার ফলে ; ভক্ত ও অভক্ত, সবই সেই একই সত্তা, একই শক্তি। "ভালো আমি" ও তিনি, এবং "বজ্জাৎ আমি" ও সমভাবেই তিনি।

রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে মিথ্যাবাদী শালা পণ্ডিত বলিয়া গালি দিয়াছেন— তাহার কারণ, বিদ্যাসাগর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বা রামকৃষ্ণের নিকটে যান নাই। ঘটনাটি এই। রামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগরের নাম শুনিয়া আসিতেছেন ; প্রসিদ্ধ গুণী মানুষের সহিত দেখা করা রামকৃষ্ণ ভালোবাসিতেন, তিনি বিদ্যাসাগরের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলেন। একটি সুযোগ জুটিল। নূতন ভক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর নিকট রামকৃষ্ণ জানিলেন যে, তিনি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন্ ইন্‌স্‌টিটিউশনের শ্যামপুকুর শাখার শিক্ষক ; জানিয়া মহেন্দ্রনাথকে ধরিলেন বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জন্য ; মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে এই ইচ্ছার কথা জানাইলে বিদ্যাসাগর স্বভাবতঃই সম্মত হইলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ অগাস্ট তারিখে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানের নিজস্ব বাড়িতে গিয়া দেখা করিলেন। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ৬২, রামকৃষ্ণের ৪৬। রামকৃষ্ণ অন্যান্য কথার মধ্যে বিদ্যাসাগরের কিছু চাটুবাদ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে বলিলেন, "আপনি একবার রাসমণির বাগান দেখতে যেয়ো, ভারি চমৎকার জায়গা।" বিদ্যাসাগর, "যাবো বৈকি" বলিয়াছিলেন কিন্তু কোনও দিনই যান নাই। এই না-যাওয়ার কারণে রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলিয়াছেন।

সত্য কী, এ-বিষয়ে তাঁহার ধারণা কী, একথা রামকৃষ্ণ একদিন ভক্তগণের নিকট বলেন, "যদি বলতুম, 'নাইবো', গঙ্গায় নামা হোলো,

মন্ত্রোচ্চারণ হোলো, মাথায় একটু জলেও দিলুম, তবু সন্দেহ হোলো, বুঝি পুরো নাওয়া হোলো না। অমুক জায়গায় হাগতে যাবো, তো, সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ি গেলুম কোলকাতায়। বোলে ফেলেছি লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই।”

আর একদিন বলিলেন, “যদি হঠাৎ বোলে ফেলি, খাবো না, তবে, খিদে পেলেও আর খাবার যো নেই। যদি বলি, ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে, —আর কেউ নিয়ে গেলে তা'কে আবার ফিরে যেতে বোলতে হবে।”

প্রাচীন ভারতীয়গণের সদাচরণ সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ মানবধর্ম শাস্ত্র, যাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় এই নির্দেশ দেওয়া আছে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে সত্য অপেক্ষা মিথ্যা ভাষণই প্রশস্ত। শূদ্রবিট্‌ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্তোক্তৌ ভবেদ্বধঃ, তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাদ্বিশিষ্যতে (৮।১০৪), যে-ক্ষেত্রে সত্য কথা বলিলে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা বিপ্রের প্রাণনাশ হইবে, সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা কর্তব্য, সেই মিথ্যা সত্য অপেক্ষা শ্রেয়ঃ, এবং কামিনীষু বিবাহেষু গবাংভক্ষ্যে তথেন্ধনে, ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্ (৮।১১২), কামিনী বিষয়ে, বিবাহ বিষয়ে, গো-খাদ্য বিষয়ে, ইন্ধন বিষয়ে এবং ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা বিষয়ে বৃথা শপথে পাতক হয় না। মহাভারতের আখ্যানে মুনি মার্কণ্ডেয়ের সহিত বনবাসী যুধিষ্ঠিরের যে কথোপকথনের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কথোপকথন উপলক্ষ্যে মার্কণ্ডেয় অপরাপর কথার মধ্যে কৌশিক নামক ব্রাহ্মণের সহিত মিথিলাবাসী এক ব্যাধের আলাপের কাহিনীও বলেন ; ব্যাধ বলিতেছেন, “সূক্ষ্মা গতির্হি ধর্মস্য বহুশাখা হ্যনন্তিকা ; প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যম্ অনৃতং ভবেৎ, অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ; যদ্‌ভূতহিতম্ অত্যন্তং তৎ সত্যম্ ইতি ধারণা, বিপর্যয়কৃতো ২ ধর্মঃ”, (বনপর্ব, ২০৯। ২-৪), ধর্মের গতিপথ সূক্ষ্ম, বহুশাখায় বিভক্ত, অনন্ত, প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে, বিবাহের কালে, মিথ্যা বলা প্রয়োজন, মিথ্যা-ভাষণই সত্য হয়, সত্যভাষণই মিথ্যা, যাহা জীবনের হিতপ্রদ তাহাই সত্য, এইটা স্থির।

যুধিষ্ঠিরের সহিত মার্কণ্ডেয়ের এই সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের কয়েক বৎসর পরে কুরুক্ষেত্র মহাসমর চলিতেছে এই অবস্থায় অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের প্রাণনাশের সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বাসুদেব কৃষ্ণ পূর্বোক্ত শাস্ত্র নির্দেশের উল্লেখ করিলেন, বলিলেন, বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত, পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি, (কর্ণ পর্ব, ৬৯।৩৩), এবং এই নীতি প্রয়োগের সমর্থনে সত্যবাদী কৌশিকের কাহিনী বলিলেন। বলিলেন যে, দস্যুদল কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কয়েকজন লোক যে বনে কৌশিক ছিলেন সেই বনে আত্মগোপন করিলেন, দস্যুগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কৌশিককে জিজ্ঞাসা করিলে কৌশিক সত্য কথা বলিয়া দিলেন এবং ইহার ফলে পলায়নপর মানুষগুলি প্রাণ হারাইলেন (কর্ণ পর্ব, ৬৯।৪৬-৫২)।

ভাগবত পুরাণেও এই নীতিরই সমর্থন পাওয়া যায়। বলির প্রতি শুক্রাচার্য বলিতেছেন, স্ত্রীষু নর্ম বিবাহে চ বৃত্ত্যর্থ প্রাণসঙ্কটে গো-ব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াংনানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতম্ (৮।১৯।৪৩)। এবং বশিষ্ঠসংহিতাতেই এই নীতির উল্লেখ আছে।

রামকৃষ্ণ উপযাচক হইয়া বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিলেন. ফিরিয়া আসিবার সময়ে বলিলেন, "আপনি একবার রাসমণির বাগান দেখতে যেয়ো, ভারি চমৎকার জায়গা"; বিদ্যাসাগর শুনিয়া "যাবো বৈকি" বলিলেন, কিন্তু যান নাই। এই "যাবো বৈকি" বলিয়া না-যাওয়া সত্যের অপলাপ হয় কি না, তাহাই বিবেচ্য। একদিকে, বিদ্যা-সাগরের নিকটে যাওয়া রামকৃষ্ণের কোনও প্রয়োজন ছিল না, কেবল কৌতূহল মেটানো। অপরদিকে, রাসমণির বাগানটি দেখিতে যাওয়া বিদ্যাসাগরের কোনও প্রয়োজন ছিল না, রামকৃষ্ণও কোনও প্রয়োজনের কথা বলেন নাই, কেবল বলিলেন, ভারি চমৎকার জায়গা। বিদ্যা-সাগরের ন্যায় মানবপ্রেমিক সমাজসেবী সদাব্যস্ত মানুষের পক্ষে রাস-মণির বাগান দেখিতে যাওয়া সময়ের অপব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যাসাগর তীর্থ বিশেষ ছিলেন, সেই তীর্থে বহু মানুষ যাইতেন, রামকৃষ্ণও গিয়াছিলেন। সেই তীর্থের পক্ষে আর্তের সেবা ছাড়িয়া, অসহায়কে সাহায্যদানের চিন্তা ছাড়িয়া রাসমণির বাগানে যাইতেই হইবে, বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে যাইবার কোনও তারিখ নির্দিষ্ট

হইল না, এ কল্পনা কোনও স্থিরমস্তিষ্ক মানুষের মনে আসে না। রাম-কৃষ্ণের মনোভাব সম্ভবতঃ অহমিকাপ্রসূত।

অবতারবাদ

রামকৃষ্ণের জীবনের শেষভাগে কয়েকজন ভক্ত তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিতে আরম্ভ করেন, এবং অবশেষে তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন যে, তিনি অবতার পুরুষ। একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পরেও কাহারও কাহারও মনে বিশ্বাস রহিয়া গিয়াছে যে, তিনি অবতার ছিলেন, এবং বর্তমানে সম্প্রদায় বিশেষের ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছেন, ইঁহাদিগকে রামাকৃষ্ণাইং বলা চলে।

অবতারবাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ধারণা, বৈদিক যুগে বা উপনিষদের যুগে ভারতীয়গণের মধ্যে অবতারবাদ ছিল না। বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচনাকালেও যে ইহা ছিল না, একথা বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ পাঠে নিশ্চিন্তভাবে বলা চলে। বাল্মীকির নিজের উক্তি এই যে, তিনি কৌতূহলবশে মুনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন পৃথিবীতে গুণবান্ ও বীর্যবান্ পুরুষ কে আছেন, উত্তরে নারদ বাল্মীকিকে রামের জীবনের মূল কাহিনীটি বিবৃত করেন। এই ভিত্তিতেই রামায়ণ রচিত। তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্ নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গম্, 'কো ন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্, ধর্মজ্ঞশ্চ, কৃতজ্ঞশ্চ, সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ··· কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষশ্চ সংযুগে, এতদিচ্ছায়ম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হিমে, মহর্ষে, ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্,' (বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ১-৫) বর্তমান কালে এমন মানুষ কে আছেন যিনি নানাগুণে ভূষিত, এবং এরূপ মহাবীর যে তাঁহাকে রুষ্ট অবস্থায় যুদ্ধে দেবগণও ভয় করেন, সেই রকম মানুষের কথা শুনবার জন্য আমার বড়োই কৌতূহল, আপনি এরকম মানুষের কথা জানতে পারেন। উত্তরে নারদ বলিলেন— ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ ···স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ··· বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে, সোম-বৎ প্রিয়দর্শনঃ, কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ (বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৮-১৮), ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম, নাম রাম, খ্যাতনামা, সকল

গুণসম্পন্ন কৌশল্যার আনন্দবর্ধন পুত্র বীর্যে বিষ্ণুর মতো, সৌন্দর্যে চাঁদের মতো, ক্রুদ্ধ হোলে আগুন, ক্ষমায় পৃথিবীর মতো। বাল্মীকির সরল কৌতূহল সমসাময়িক কালের মানুষ সম্পর্কে—"কঃ নু অস্মিন্ সাম্প্রতম্ লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্ ত্বম্ সমর্থোঽসি জ্ঞাতুম এবং বিধম্ নরম্", বর্তমানে পৃথিবীতে একাধারে নানাগুণে গুণবান্ ও বীর্যবান্ কে আছেন, আপনার এমন মানুষের কথা জানা থাকতে পারে, থাকলে বলুন—এবং বিধম্ নরম্, এইরকম একজন মানুষের সম্পর্কে জানার কৌতূহল। সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নারদ রামের নাম করিলেন ; এবং তৎপরে রামের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত করিলেন —পিতা দশরথ কর্তৃক রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা, কৈকেয়ীর ইচ্ছায় রামের বনগমন, বনে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রাবণ-বধ, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ, এই কয়টি ঘটনা. "তমেবংগুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠ গুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্··· যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুম্ ঐচ্ছৎ", হইতে আরম্ভ করিয়া "রামঃ সীতামনু প্রাপ্য রাজ্যং পুনঃ অবাপ্তবান্" পর্যন্ত। (১।১।১৯-৮৯) বাল্মীকির প্রশ্নটি ঈশ্বর সংক্রান্ত, বা, ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত, বা, সৃষ্টিরহস্য সংক্রান্ত ছিল না, একজন মনুষ্যসম্পর্কে জানিবার কৌতূহল মাত্র ছিল, নারদের উত্তরও রাম নামে জনৈক সমসাময়িক মানুষের জীবন কথা। নারদ তাঁহার উত্তরে দশরথ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামের নামের উল্লেখ করিলেন, এবং যুবক রামের জীবনের কয়েকটি মুখ্য ঘটনা বিবৃত করিলেন। এই কাহিনীতে রাম ঈশ্বরের অবতার একথা নাই। এমনকি ঈশ্বর নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন এবং একজন নররূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে পারেন, এ জাতীয় ধারণার সমর্থনেও কিছুই নাই। এই প্রসঙ্গে রামের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরের কিছু ঘটনা যেভাবে মহাভারতে লিপিবদ্ধ, তাহার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হইবে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পত্নী কৃষ্ণা ও চারি ভ্রাতার সহিত বনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন ঘটনাচক্রে সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ কৃষ্ণাকে একা পাইয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি সংবাদ পাইয়া পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জয়দ্রথকে পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া সেখানে উপস্থিত পূর্বোল্লিখিত মুনি মার্কণ্ডেয়কে প্রশ্ন করিলেন, অস্তি নূনং ময়া

কশ্চিদল্পভাগ্যতরো নরঃ (মহাভারত, বন পর্ব, ২৭৩।১২) আমার চেয়ে অল্পভাগ্য আর কোনও মানুষ কি আছেন? উত্তরে মার্কণ্ডেয় রামের নাম করিলেন, বলিলেন, প্রাপ্তম্ অপ্রতিমম্ দুঃখম্ রামেণ (বন পর্ব, ২৭৪।১), রাম যা দুঃখ পেয়েছেন তা'র অবধি নেই, এবং যুধিষ্ঠির রাম-সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার কৌতূহল প্রকাশ করায় মার্কণ্ডেয় মূল ঘটনাগুলি বলিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের আরম্ভ হয়, এবং সেই সমরে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু হইলে শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ সান্ত্বনাদান উপলক্ষ্যে পূর্বে পুত্র-শোকাতুর রাজা সৃঞ্জয়কে নারদ যাহা যাহা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সেগুলির পুনর্বিবৃতি করিলেন, তন্মধ্যে রাম সম্পর্কে উল্লেখ ছিল,—নারদ সৃঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন, "রামং দাশরথিং চৈব মৃতং, সৃঞ্জয়, শুশ্রুম যং প্রজা অন্বমোদন্ত পিতা পুত্রান্ ইব ঔরসান্···স চেন্মমার, সৃঞ্জয়, চতুর্ভদ্রতরস্ত্বয়া পুত্রাৎ পুণ্যতরঃ তুভ্যং, মা পুত্রম্ অনুতপ্যথাঃ", (মহাভারত, দ্রোণ পর্ব, ৫৯।১, ২৪-২৫), মরা ছেলের জন্য শোক কোনো না, দেখ, তোমার ছেলের চেয়ে পুণ্যবান্ প্রজারঞ্জক দশরথের পুত্র রামও মৃত্যু-মুখে পড়েছেন বোলে শুনি। রামায়ণের এবং মহাভারতের এই অংশগুলি বিবেচনা করিলে এইরূপ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য পিতা নরপতি দশরথের উদ্যম হইতে আরম্ভ করিয়া রামের অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই চতুর্দশ বৎসরের যে কাহিনী বাল্মীকি শ্লোকচ্ছন্দে রচনা করেন, তাহার মধ্যে অবতারবাদের কথা ছিল না। বাল্মীকি তাঁহার ষট্‌কাণ্ডাত্মক রামায়ণে* রাম নামে জনৈক গুণবান্ বীর্যবান্ পুরুষের বিবরণই লিখিয়াছেন, ইহাতে ঈশ্বরের অবতরণ কিংবা রামকে ঈশ্বরের অবতার বলিবার প্রশ্নই ওঠে নাই। এই দৃষ্টিতে বাল্মীকি রামায়ণ পরিচয়ে বর্তমানে যে সপ্তকাণ্ডাত্মক গ্রন্থটি প্রচলিত উহার অবতার সংক্রান্ত অংশগুলি বহু পরবর্তী কালে অপর কোনও লেখকের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কালেও অবতারবাদের উৎপত্তি হয় নাই, দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের গ্রন্থনে অথবা রাজা জনমেজয়ের নিকট বৈশম্পায়নের ভাষণে, কিংবা নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণের নিকট সুত উগ্রশ্রবসের বিবৃতিতেও

---

* এ বিষয়ে মৎ প্রণীত ''সংসার পথে'' নামক গ্রন্থে কিছু আলোচনা আছে. ঐ গ্রন্থের ৫৫ হইতে ৫৬ সংখ্যক পৃষ্ঠায়।

উহার উল্লেখ ছিল না। এই অভিমতের সমর্থনে উপলক্ষ্য বিশেষে বাসুদেব কৃষ্ণের আচরণ ও উক্তি যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সমাপ্তি হইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের পক্ষে জয় হইয়াছে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এই জয়কে পরাজয় মনে করিলেন, কারণ, প্রিয় আত্মীয়স্বজন সকলেই নিহত, কাহাকে লইয়া রাজ্যভোগের আনন্দ উপভোগ করিবেন? শোকাভিভূত যুধিষ্ঠির বলিলেন, "জয়োঽয়মজয়াকারঃ প্রতিভাতি মে" (শান্তি পর্ব, ১।১৫), বলিলেন, "ধিগস্তু ক্ষত্রমাচারম্", "বয়ং তু লোভান্মোহাচ্চ দম্ভং মানং চ সংশ্রিতাঃ ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা রাজ্যলাভবুভুৎসয়া" (শান্তি পর্ব, ২৯।৫,৭), ক্ষত্রিয়বৃত্তিকে ধিক, আমরা রাজ্যলাভের ইচ্ছায় লোভ, মোহ, দম্ভ ও মান পরবশ হয়ে এই অবস্থায় পড়েছি। এবং অরণ্যবাসী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, বনমামন্ত্র্য বঃ সর্বান গমিষ্যামি, (৭।৪০), হিত্বা গ্রাম্য সুখাচারংতপ্যমানো মহৎ তপঃ অরণ্যে ফলমূলাশী চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ (৯।৪), গ্রামের সুখ, আচার, ত্যাগ কোরে অরণ্যে ফলমূল আহার কোরে জীবজন্তুর সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। তপশ্চর্যা করবো, তোমরা যদি যেতে চাও, তো, চলো। যুধিষ্ঠিরের এই সময়ের মনের অবস্থা মহাসমর আরম্ভ হইবার পূর্বে সমবেত দুই যুযুৎসু সেনাবাহিনীকে দেখিয়া অর্জুনের মনের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার অনুরূপ। সে-সময়ে অর্জুন বাসুদেব কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, দৃষ্টেমং স্বজনং, কৃষ্ণ, যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্, সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি, বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে, গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ, ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে, ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং, ভ্রমতীব চ মে মনঃ, ...ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনম্ আহবে, ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং, কৃষ্ণ, ন চ রাজ্যং সুখানি চ (ভীষ্ম পর্ব, ২৫ অধ্যায়, ২৮-৩০, ৩১-৩২)। অর্জুনের সেই অবস্থায় বাসুদেব কৃষ্ণ নানা কথা বলিয়া অর্জুনের মতের পরিবর্তন ঘটাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজ্যসুখ উপভোগের পরিবর্তে যুধিষ্ঠিরের বনগমনে যাইবার ইচ্ছা লক্ষ করিয়া অর্জুন, ভীম, আদি বোঝাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া অর্জুনের মনে পড়িল বাসুদেব কৃষ্ণের persuasive ক্ষমতার কথা, অর্থাৎ কাহাকেও বোঝাইয়া মত পরিবর্তন করাইবার শক্তির কথা; এবং অর্জুন বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন। বলিলেন, জ্ঞাতি শোকাভিসন্তপ্তো ধর্মপুত্র পরন্তপঃ এষ শোকার্ণবে মগ্নঃ, তম্ আশ্বাসয়, মাধব, ...অস্য শোকং, মহাবাহো,

প্রাণাগয়িতুম্ অর্হসি, (শান্তি পর্ব, ২৯ অধ্যায়, ২-৩), শোকাকুল যুধিষ্ঠিরের শোক দূর করো। যুধিষ্ঠির বাল্যকাল হইতেই বাসুদেব কৃষ্ণকে স্নেহ করিতেন, অর্জুনের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ কৃষ্ণের প্রতি ছিল, তিনি কৃষ্ণের কথা ঠেলিতে পারিতেন না — অনতিক্রমণীয়ো হি ধর্মরাজস্য কেশবঃ, বাল্যাৎ প্রভৃতি গোবিন্দঃ প্রীত্যা চাভ্যধিকোঽর্জুনাৎ, (২৯।৫)। বাসুদেব অতিসাধারণ কথা দিয়া আরম্ভ করিলেন, বলিলেন, মা কথাঃ··· শোকম্ ন হি তে সুলভা ভূয়ো যে হতাস্মিন্ রণাজিরে (২৯।৮), শোক করবেন না, যুদ্ধে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা তো আর ফিরে আসবেন না। এবং এই ভাবের আর দুই একটি কথা বলিয়া, সৃঞ্জয়ের প্রতি নারদের সান্ত্বনা দানাত্মক কথাগুলির পুনর্বিবৃতি করিলেন, যেগুলি কয়েকদিন পূর্বে দ্বৈপায়ন এই যুধিষ্ঠিরের নিকটই অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে করিয়াছিলেন— মানুষ, সে যেই হউক, তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই সত্যের নির্দেশ। বাসুদেব কৃষ্ণকে আরও কথা বলিতে হইল, এবং সেইসঙ্গে দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ, যিনিও এসময়ে উপস্থিত, তিনিও কর্তব্য সম্পর্কে নানা উপদেশ দিলেন, এবং অবশেষে যুধিষ্ঠির বনগমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। তৎকালের অবস্থা যেভাবে জয়-কাহিনীতে বর্ণিত, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না যে, এসময়ে কেহই বাসুদেব কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন না, মনুষ্যমাত্রই মনে করিতেন। ঘটনাটি ঘটে মূল জয়-কাহিনীর অবসানের পরে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অবসানের পরে, যে-কাহিনী শুনিবার জন্য পরীক্ষিতের আগ্রহ ছিল। ইহার পূর্বেও বাসুদেব কৃষ্ণ সম্পর্কিত বহু ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার বিবৃতি জয়-কাহিনীতে আছে, এবং যেগুলি হইতে এই কথা স্পষ্ট যে সমসাময়িক কালের মানুষ বাসুদেব কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র মনে করিতেন, ঈশ্বরের অবতার মনে করিতেন না। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, ভাগবত-রচয়িতার এই ধারণা (১।৩।২৮), শত শত বৎসর পরের উৎপত্তি।

অবতারবাদ উপলক্ষ্যে রামায়ণের এবং মহাভারতের যুগের অপর একজনের কথা বলিতে হয়, তাঁহার নামও রাম, তিনি জমদগ্নি নামক ব্যক্তির পুত্র বলিয়া তাঁহাকে জামদগ্ন্য রাম বলা হয়, তিনি পরশুরাম নামে সমধিক পরিচিত। অযোধ্যার রাম, যিনি দশরথের পুত্র বলিয়া দাশরথি রাম নামে উল্লিখিত হন, দ্বারকার কৃষ্ণ, যিনি

বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব কৃষ্ণ নামে উল্লিখিত হন. এই উভয়েই ক্ষত্রিয়বর্ণের ছিলেন, কিন্তু জামদগ্ন্য রাম বিপ্রবর্ণের। জামদগ্ন্য রামের উল্লেখ দাশরথি রামের সহিত তাঁহার সজ্ঘর্ষ উপলক্ষ্যে রামায়ণে স্থান পাইয়াছে, এবং দেবব্রত ভীষ্মের সহিত তাঁহার সজ্ঘর্ষ উপলক্ষ্যে মহাভারতে স্থান পাইয়াছে। জামদগ্ন্য রামকে কেহ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন, এইরূপ ধারণার আভাসমাত্র রামায়ণে বা মহাভারতে কুত্রাপি নাই। রামায়ণের যুগে কিংবা মহাভারতের যুগে প্রাসঙ্গিক অঞ্চলগুলির অধিবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে অবতারবাদের উদ্ভব যে হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। ঈশ্বর নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, বা, করিতে পারেন, এ-জাতীয় ধারণা, বা কল্পনা, বা বিশ্বাস সে সময়ে ঐসব অঞ্চলের ভারতীয়গণের মধ্যে ছিল না, তাঁহারা সত্যানুসন্ধী ছিলেন, তাঁহারা মিথ্যা, উদ্ভট, শিশুসুলভ ধারণাকে মনে স্থান দিতেন না।

উত্তর ভারতীয়গণের মধ্যে অবতারবাদের উদ্ভব হয় তাঁহাদের চিন্তাধারায় অবনতির যুগে, যে-যুগে সত্যের সূর্যের প্রতি পশ্চাৎ ফিরাইয়া রাত্রির তমসার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, সত্যের আলোকের স্থলে মিথ্যার অন্ধকারে সুপ্তি আসিয়াছে।

সম্ভবতঃ, অবতারবাদের যখন প্রথম সূত্রপাত হয়, তখন মহান্ কর্মীকেই অবতার বলা হইত, যেমন, দাশরথি রাম, বাসুদেব কৃষ্ণ। ক্রমশঃ অবতারগোষ্ঠির মধ্যে ভগবদ্ভক্তগণকেও স্থান দেওয়া আরম্ভ হইল। এবং কিছুকাল ধরিয়া প্রত্যেক গুরুই স্বীয় শিষ্যগণের নিকট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য হইতেছেন। অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ, অবতার অসংখ্য, ভাগবত রচনাকারের এই উক্তি (১।৩।২৬), এখন বর্ণে বর্ণে সত্য। অবতারবাদ বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় কর্মবিমুখের, অকর্মণ্যের পূজা। এবং ভারতবর্ষের হিন্দুগণের মধ্যেই যে এই বাদ সীমাবদ্ধ, তাহাও নহে। অন্যত্রও আছে, অন্য ধর্মীয়গণের মধ্যেও আছে।

অবতারবাদের গুরুতর দোষ এই যে, ইহাতে ঈশ্বরের স্থানে একজন মানুষমাত্রকে স্থাপন করা হয়, ছায়া দিয়া কায়াকে ঢাকা হয়, নিজের বিচারবুদ্ধির অবমাননা করা হয়, ঐশী শক্তির অবমাননা করা হয়। অবতারবাদীরা ভক্তিবাদী। ভক্তিবাদীরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্, কিন্তু ঈশ্বরের স্থানে একজন মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা কি ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ নয় ?

বিদ্যাসাগরকেও সে-সময়ে কেহ কেহ অবতার বলিতেন। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যু পর্যন্ত রামকৃষ্ণকে অল্প লোকেই চিনিতেন, বিদ্যাসাগরের নাম ভারতবর্ষব্যাপী ছিল। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস পশ্চিম ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া অবশেষে পুষ্করে আসিয়া পুত্রকে পত্র লিখিলেন, "লোকে তোমার পরিচয়ে আমাকে চেনে, তুমি আমার বংশে রামাবতার"। কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাকে নর-নারায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দয়ার অবতার বলিতেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কর্মচারী কৈলাসচন্দ্র বসু ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিকৃতির নিচে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, মূর্তিমদ্দৈবতং ভুবি, পৃথিবীতে মূর্তিমান্ দেবতা। কিন্তু বিদ্যাসাগর আপত্তি করিতেন, বলিতেন, "তোমাদের স্নেহ পাই, তাহাই আমার লাভ, অবতার হইতে চাই না"। যে-অবতার পদ প্রাপ্তির জন্য রামকৃষ্ণ লালায়িত ছিলেন, সে-পদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের বিন্দুমাত্র লিপ্সা ছিল না।

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস

ঈশ্বরচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ সকল বিষয়েই পরস্পরের বিপরীত। ঈশ্বরচন্দ্র দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও পালিত হইয়া নিজের অদম্য চেষ্টায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন; রামকৃষ্ণ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থায় লালিত-পালিত হইয়া, সুযোগসুবিধা সত্ত্বেও অতি অল্পই লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ দিয়া ছিলেন পিতা কিশোর অবস্থায়, মাত্র চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সে, তাঁহার নিজের ইচ্ছা ছিল না, তাঁহার ইচ্ছা ছিল চিরকুমার থাকিয়া জনগণের সেবা করিবেন; কিন্তু বিবাহিত হইয়া তিনি স্ত্রীর প্রতি সমস্ত কর্তব্যই পালন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বিবাহ করেন স্বেচ্ছায় যৌবনে, তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সে, নিজের পছন্দমতো পাঁচ ছয় বৎসরের শিশুকে; কিন্তু বিবাহ করিয়া কিছু অলঙ্কার গড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন তিনি স্ত্রীর প্রতি কোনও কর্তব্যই পালন করেন নাই; সপরিবারে পরগৃহবাসী পরান্নভোজী হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিলে সাধ্বী স্ত্রীকে প্রতিপালন ও তাঁহার সহিত সহবাস অবশ্য করণীয়; ইহাই হিন্দুদিগের শাস্ত্রের নির্দেশ। পুরুষ স্বীয় সাধ্বী ভার্যাকে পোষণের জন্য গার্হস্থ্য কর্ম করিবেন এবং তাঁহার সহিত ঋতুকালে সহবাস করিবেন—ইহাই ভারতীয় হিন্দুগণের আদর্শ।

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা (মানব ধর্মশাস্ত্র ৩।৪৫),
বাচাশ্চানুপযন্ পতিঃ (মানব ধর্মশাস্ত্র ৯।৪) ।

ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে বিলাসের সম্পূর্ণ অভাব ছিল ; নিজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করা সত্ত্বেও মোটা থান ধুতি, মোটা চাদর, চটি জুতা ও সামান্য আহার—ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। রামকৃষ্ণও সাধারণতঃ বিলাসী ছিলেন না বটে— তিনি লালপেড়ে ধুতি, জামা, মোজা, জুতা পরিতেন, শীতে মোল্‌স্কিনের র‍্যাপার প্রভৃতি শীতবস্ত্র গায়ে দিতেন— কিন্তু তাঁহার মনে সময়ে সময়ে বিলাস-বাসনা জাগিত এবং তিনি তাহা পূর্ণ করিয়া লইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল ব্যায়ামপুষ্ট সুস্থ সবল দেহ, তিনি মাইলের পর মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতেন। রামকৃষ্ণ বাহ্যতঃ স্থূলকায় হইলেও তাঁহার এক-পা যাইতে গাড়ি কিংবা পালকি লাগিত।

ঈশ্বরচন্দ্রে ছিল বিচারবুদ্ধি, রামকৃষ্ণে ভাবপ্রবণতা। ঈশ্বরচন্দ্র আট নয় বৎসর বয়সে পথ চলিতে চলিতে মাইল-স্টোন্ দেখিয়া ইংরাজি সংখ্যাসূচক অঙ্ক চিনিলেন, এবং পরদিনই ইংরাজি অঙ্ক লেখা বিল ঠিক দিতে পারিলেন, রামকৃষ্ণ চিরকাল অঙ্কে কাঁচা, অঙ্ক বুঝিতে গেলে মাথা টন্‌টন্ করিত। ঈশ্বরচন্দ্রের মন ছিল কুসংস্কারমুক্ত, তিনি গোবীজ টিকা প্রচলন ও চড়কের কুপ্রথা নিবারণ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন ; রামকৃষ্ণের মন ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূত-পেত্নী, হাঁচি-টিকটিকি ইত্যাদিতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস।

রামকৃষ্ণের ছিল নিষ্ক্রিয় নির্লোভতা ; তিনি প্রথম জীবনে একবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' এইকথা বলিয়া হাতে টাকা লইয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন, অন্য এক উপলক্ষ্যে লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারি দশ হাজার টাকা দিতে চাহিলে পত্নীর মত জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং পত্নী আপত্তি জানানোয় লইলেন না ; কিন্তু তাঁহার ছোটো ছোটো লোভ মাঝে মাঝে হইত, এবং তাহা ভক্তগণের নিকট হইতে চাহিয়া পূরণ করিয়া লইতেন ; এবং দীর্ঘকাল সপরিবারে মথুরা বিশ্বাস, শম্ভু মল্লিক, সুরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ধনিগণের অর্থে জীবনধারণ করিয়া অবশেষে বুঝিয়াছিলেন যে, টাকা ঠিক মাটি নয়, উহাতে তাঁহারও প্রয়োজন আছে, এবং বলিয়াছিলেন, "সাধুদের কেউ টাকা পয়সা দেবে না তো (সাধুরা)

খাবে কি কোরে ?" বিদ্যাসাগর কোনও দিন গঙ্গার জলে টাকা ফেলেন নাই, কিন্তু তাঁহার ছিল সক্রিয় নির্লোভতা— এক হাতে উপার্জন করিয়াছেন, অন্য হাতে দুঃখীর দুঃখ নিবারণে বিলাইয়া দিয়াছেন ; অর্থের লোভ বা সুখভোগের লোভ কোনও দিন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদিয়া গিয়াছেন জীবের দুঃখে, তিনি আবাল্য সেবা-ব্রতী ; বাল্যকাল হইতেই কাহারও ব্যাধি হইয়াছে জানিলে সেবা করিতে ছুটিতেন, রাত্রি জাগিয়া রোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন, সংক্রামক রোগ দেখিলেও দ্বিধা করিতেন না। রামকৃষ্ণ মানুষের দুঃখে নির্বিকার ; তিনি বাল্যকাল হইতেই সুখের পায়রা, যে-বাড়িতে আনন্দ সে-বাড়িতে যাইতেন, যেখানে দুঃখ তাহার ধার দিয়া ঘেঁসিতেন না ; জীবনে তিনি কোনও রোগীর শুশ্রূষা করেন নাই, কাহারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই, বরঞ্চ অপরের পাপে নিজের রোগ হইল এই অভিযোগ সর্বদা করিতেন। রামকৃষ্ণের যত রোদন ভগবানকে পাওয়ার জন্য, মানুষের দুঃখের জন্য তাঁহার অশ্রু নাই। জীবের দুঃখে দুঃখী বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র সাময়িকভাবে আমিষ ছাড়িলেন, দুগ্ধপান পর্যন্ত ছাড়িলেন ; রামকৃষ্ণের মনে এ-দ্বিধা বিশেষ আসে নাই, জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি আমিষ আহার করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর উৎসাহী কর্মী, পথিকৃৎ। তিনি সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রণ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক, শিক্ষা-পুস্তক প্রণয়নে অগ্রণী, শিক্ষা বিস্তারে অগ্রদূত— নিজ অর্থ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, সরকারি বিদ্যালয় তাঁহার মাধ্যমে স্থাপিত হইয়াছে, অন্য মানুষকে বিদ্যালয় স্থাপনে প্ররোচিত করিয়াছেন। তিনি রোগীর চিকিৎসার জন্য নিজ ব্যয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অপরকে দিয়া করাইয়াছেন। অপরপক্ষে, রামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা। শিক্ষাবিষয়ে তিনি কোনও দিনই আগ্রহী ছিলেন না, মনে করিতেন যে, বিদ্যাশিক্ষার অর্থ অপরাবিদ্যা শিক্ষা, সুতরাং বর্জনীয়, মনে করিতেন যে, ঈশ্বরকে জানিলেই সব শিক্ষা হইয়া যায়— সংবাদ-পত্র পর্যন্ত অস্পৃশ্যবোধে দূরে সরাইয়া রাখিতে বলিতেন। হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি প্রতিষ্ঠাকরণ প্রভৃতি জনহিতকর কর্মে তিনি কোনও দিনই উদ্যোগী হন নাই, বরঞ্চ, কেহ উদ্যোগী হইলে নিরুৎসাহ করিতেন— হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি দিয়া কি হইবে, ঈশ্বরকে লাভ করো।

মানুষের দুঃখ দূর করার প্রয়াসকে তিনি ধাঁড়াপুতি বুদ্ধির ফল বলিতেন। রামকৃষ্ণের পরিচয় কথায়, বিদ্যাসাগরের পরিচয় কাজে। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের নিকট রামকৃষ্ণের চরিত্র খদ্যোতাচিরিবাহনি, দিনে জোনাকির আলোর মতো নিষ্প্রভ।

তথাপি রামকৃষ্ণের ছিল অকৃত্রিম ঈশ্বরানুরাগ। ইহা কি রামকৃষ্ণের চরিত্রকে তুলনামূলকভাবে অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করে নাই? দিবারাত্র "ভগবান্", "ভগবান্" করিয়া জীবন কাটাইয়া দেওয়া, ইহাই কি চরম আদর্শ নয়? সংসার কি অসার নয়, ভগবান্ই কি একমাত্র সার নয়? ভারতীয় দর্শন, আন্বীক্ষি কী, ইহার কি উত্তর দেয়? মানবজীবনের আদর্শ সম্পর্কে দর্শনের ইঙ্গিত কি? এই প্রশ্নের বিবেচনা অবশ্যই করণীয়। বিদ্যাসাগরের জীবনধারা এবং রামকৃষ্ণের জীবনধারা, এই দুইটি পরস্পর ভিন্নমুখী জীবনধারার কোন্‌টি সাধারণ মানুষের অনুসরণীয়, কোন্‌টি প্রাচীন যুগের উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের উন্নত অধিবাসিগণ অনুসরণীয় বিবেচনা করিতেন, তাঁহাদের যুগে রচিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলিতে এ-সম্বন্ধে কী আভাস পাওয়া যায়? কী আচরণ তাঁহারা আদর্শ আচরণ বিবেচনা করিতেন?

দর্শনে আদর্শ

কোন্ চরিত্রের মানুষ সেযুগে আদর্শ বিবেচিত হইতেন, এই প্রশ্নের উত্তর মুনি নারদের মুখে পাওয়া যায়, তিনি তপস্বী বাল্মীকির কৌতূহল মিটাইতে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং আরও কিছুকাল পরে, তিনি সৃঞ্জয়কে সান্ত্বনাসূচক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে নারদের সে দুটি বিবৃতিরই উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। তপস্বী বাল্মীকির কৌতূহল হইল সে-সময়ে এমন মনুষ্য কে আছেন যাঁহার মধ্যে একাধারে যাবতীয় মনুষ্যোচিত গুণ বিদ্যমান, যিনি চরিত্রবান্, সত্যাশ্রয়ী দৃঢ়ব্রত, বিদ্বান্, সুদর্শন, জিতক্রোধ, বিদ্বেষ-বুদ্ধিহীন, সকলের হিতকারী, বীর্যবান্, ক্রুদ্ধ হইলে ভয়াবহ, এই যাবতীয় গুণের অধিকারীকে তাহা জানিবার জন্য। উত্তরে নারদ ইক্ষ্বাকুবংশের রামের নাম করিলেন, এবং কী কারণে তিনি রামকে উচ্চ আসন দিতেছেন তাহা বুঝাইতে রামের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বিবৃত করিলেন। সেই বিবৃতির ভিত্তিতে বাল্মীকি

রামায়ণ রচনা করেন। নারদের সংক্ষিপ্তি, বাল্মীকির বিস্তৃত বিবরণ, এই উভয় হইতেই ইহা স্পষ্ট যে, দশরথপুত্র রামের সুনামের কারণ তাঁহার কর্ম— যে-মুহূর্তে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজসুখ ভোগ করিবার কল্পনা করিতেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁহাকে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বনচারীর বল্কল পরিধান করিয়া মহা অরণ্যের পথে পা বাড়াইতে হইল, ইহাতে তিনি বিন্দুমাত্র ভাঙিয়া পড়িলেন না, দিনের পর দিন একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর বনে বনে কাটাইলেন, ভিক্ষার পাত্র লইয়া না বেড়াইয়া নিজশ্রমে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া, পশুপক্ষী সংহার করিয়া উদরপূর্তি করিলেন, এবং অবশেষে যখন দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য আঘাত করিল, তাঁহার পত্নী জনৈক দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা হইলেন, তিনি ধৈর্যের এবং শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, দুর্বৃত্তকে সদলে নিধন করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন করিলেন। ঈশ্বরের নিকট অসহায়তা প্রকাশ, ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা, তিনি একবারও করেন নাই। কয়েক বৎসর পরের ঘটনা— রামের মৃত্যুর বহুকাল পরে, রামের নাম যখন জনশ্রুতিতে পরিণত, সে-সময়ে একদা নরপতি শৈব্যের পুত্র নরপতি সৃঞ্জয়ের গুণবান্ পুত্র দস্যুগণ কর্তৃক নিহত হইলে সৃঞ্জয় শোকে আকুল হইলেন। নারদ সৃঞ্জয়ের বন্ধু ছিলেন, তিনি আসিয়া সান্ত্বনা দান উপলক্ষ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম করিলেন, যাঁহারা সর্বগুণের অধিকারী হইয়াও মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারেন নাই; বলিলেন যে, এই-সব গুণবান্ ব্যক্তিকেও তো মরিতে হইয়াছে। এই কথা বিবেচনা করিয়া তোমার গুণবান্ পুত্রের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করো— তিনি মরুও হইতে আরম্ভ করিলেন, যে মহাত্মা মরুও বিচারবুদ্ধিকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়াছিলেন। যে বিচার-বুদ্ধির আলোকে গুরুও বর্জনীয়, (মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ১৭৮।৪৮) এবং তাহার পরে সুহোত্র, পৌরব, শিবি, দশরথপুত্র রাম, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, নহুষপুত্র যযাতি, গার্ভাগ-পুত্র অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, দুষ্যন্তপুত্র ভরত, পৃথু এবং সর্বশেষে জমদগ্নিপুত্র রামের নাম করিলেন। নামগুলি বলার সহিত নারদ ইঁহাদের প্রত্যেকের খ্যাতির কারণ বলিলেন; ইঁহারা প্রত্যেকে উদ্যোগী পুরুষসিংহ, ইঁহাদের পরিচয় কর্মে, কর্মের জন্যই ইঁহারা স্মরণীয়; কেহই ভগবান্‌কে খুঁজিয়া বেড়ান নাই, ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন নাই, লোকহিতকর কর্ম করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন। সর্বশেষে

যাঁহার নাম করা হয়, সেই জমদগ্নিপুত্র রাম তখনও জীবিত, এই রাম সম্পর্কে নারদ বলিলেন, এই রামও মরিবেন (মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ৫৫-৭০ অধ্যায়)।

নারদের উক্তি হইতে এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে যুগে কৃতকর্মা পুরুষকেই আদর্শ পুরুষ বলিয়া, মহাপুরুষ বলিয়া, বিবেচনা করা হইত, কর্মত্যাগী ভগবদ্ভক্তকে নহে, আজগর ব্রতাবলম্বীকে নহে, যে আজগর মুনির সহিত রাজা প্রহ্লাদের সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইয়াছিল বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত (শান্তি পর্ব, ১৭৯ অধ্যায়), সেই মুনিকে নহে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ঐ আচরণ কেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। উহার মূল কথাগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯), নানা নাই, বহু নাই, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১), স এ বেদং সর্বম্ (ছান্দোগ্য ২৫। ১), সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য ২), ঈশা বাস্য-মিদং সর্বম্ (ঈশ ১), এই সকলই এক, ব্রহ্ম, দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ, মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ, যজ্ঞ, সচ্চ, ত্যচ্চ, (বৃহদারণ্যক, ২।৩।১), ব্রহ্মের দুইরূপ—মূর্ত তথা অমূর্ত, মরণশীল তথা অমর, স্থিত তথা চলন্ত, অস্তিত্বশীল তথা অস্তিত্বরহিত, তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তদন্তরস্য সর্বস্য তদ্ব সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ (ঈশা ৫), উহা চলে, উহা চলে না, উহা দূরে, আবার উহা নিকটে, উহা এইসব কিছুর অন্তরে, আবার উহা এইসব কিছুর বাহিরে, সহিকর্তা (বৃহদারণ্যক ৪।৩।১০), স হি সর্বস্য কর্তা (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৩), তিনিই কর্তা সব-কিছুর কর্তা। জলে জলময়, আইল বাঁধিবার উপায় নাই। যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহম্ অস্মি ইতি, ন স বেদ, (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০) যিনি ঈশ্বর আমা হইতে ভিন্ন এই বোধে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞ।

অবশ্য, একথা সত্য যে, শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ (মহাভারত, বনপর্ব, ৩১৩।১১৭) বিভিন্ন শ্রুতি বিদ্যমান। কোনও কোনও উপনিষদের কোনও কোনও শ্লোকে নানাভিত্তিক উক্তি আছে, এক অস্তিত্বের পরিবর্তে নানা অস্তিত্ব, এক কর্তৃত্বের পরিবর্তে নানা কর্তৃত্বভিত্তিক উক্তি আছে। এ-বিষয়ে বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। পূর্বে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের উক্তি, তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানম্ উপসংহরতি ইত্যাদি (৪।৪।৩) অর্থাৎ জীবাত্মা জোঁকের মতো সংক্রমণ করে, এক

দেহ বর্জন ও দেহান্তর গ্রহণ যুগপৎ করে, এটি নানাভিত্তিক। এটিতে পৃথক্ জীবাত্মার কল্পনা করা হইতেছে, কোটি কোটি স্বতন্ত্র জীবাত্মা যেন দেহরূপ আশ্রয় পরিবর্তন করিয়া বেড়াইতেছে। ঐভাবেরই ঐতরেয় উপনিষদে— সইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে (২।১।৪) ঐভাবেরই কঠোপনিষদের একটি উক্তি— অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (২।৩।১৭), অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণের আত্মা সকল জনের অন্তরে রহিয়াছে, উক্তিটি অবিকল ঐ ভাষায় শ্বেতাশ্বতরেও আছে (৩।১৩), কঠোপনিষদের অন্যতম উক্তি— ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে (২।১।১৮), অর্থাৎ শরীরের বিনাশ আছে, আত্মার বিনাশ নাই, কঠোপনিষদের অপর একটি উচ্ছ্বসিত প্রকাশ— ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ (২।৩।৩), অর্থাৎ ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, সূর্য তাপ দেন, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু ভয়ে ধাবিত হন, অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু এই পাঁচের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, পৃথক্ কর্মক্ষমতা আছে, ইঁহারা ব্রহ্মের ভয়ে স্ব-স্ব করণীয় করেন, এবং প্রায় ঐ একই ভাষায় তৈত্তিরীয়ে প্রকাশিত— ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষাদেতি সূর্যঃ, ভীষাদস্মাদগ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ (২।৮)—এইগুলিও ঐ শ্রেণীর।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সার কথা অবশ্য পূর্বোল্লিখিত, নেহ নানাস্তি, নানা নাই, একাধিক নাই। একই সত্তা আছেন, একই শক্তি আছেন, একই ইচ্ছা, একই কর্তা। যাহাকে আমরা প্রস্তরখণ্ড মনে করি তাহাও যাহা, যাহাকে সূর্য মনে করি তাহাও তা'ই, যাহাকে মানুষ মনে করি তাহাও তা'ই। আমাদের বুদ্ধিতে যাহা জড় এবং আমাদের বুদ্ধিতে যাহা চেতন, উভয়ই এক। আকাশ ও আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি সকলই এক। তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী। তিনিই মৃত্তিকা তিনিই কুম্ভকার। পৃথক্ ঈশ্বরের ধারণা মিথ্যা, পৃথগীশ্বরভিত্তিক যাবতীয় চিন্তা ও ক্রিয়া ভ্রান্ত। মিথ্যা নানা সত্য এক। মিথ্যা সুর বহু, যথার্থ সুর এক। বেসুর অনেক, খাঁটি সুর একটাই।

ঈশ্বর নাই নহে, ঈশ্বর ভিন্ন নাই। অধ্যাত্মবাদের এই ধারণার অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত জীবনে কর্ম করিয়া যাওয়া— কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ (ঈশ ২), কর্ম করিয়া যাও, শত বৎসর বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা করো, উপনিষদের এই বাণী।

অবশ্য, কতকগুলি প্রশ্ন এই উপলক্ষ্যে স্বতঃই মনে জাগে। প্রথমেই মনে হয় যে, সবই যদি এক, তাহা হইল মৃত্যুর অর্থ কি? জীবন্ত, না মৃত, এই পার্থক্য বোধহয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর উপনিষদের ভাষায় সোঽকাময়ত, স ঐক্ষত, অদ্বিতীয়ের 'কামনা'। যে-কামনার ফলে এক হইতে নানা মানুষের যাবতীয় বোধ, সকল জীবের সকল প্রকারের বোধ, মহাকামনায়, মহাইচ্ছায়— যে-ইচ্ছায় আদি মহাশক্তি হইতে পদার্থ উদ্ভূত বলিয়া মানুষের ধারণ; সদেব ইদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। মনে করা যাইতে পারে যে, এক বিরাট সত্তা সমুদ্র কম্পিত হইতেছে, সেই কম্পনই জগৎ-চাঞ্চল্য — যাহা কিছু ঘটিতেছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহা প্রশ্নটির উত্তর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার অন্যতরা ভার্যা মৈত্রেয়ীকে সরল ভাষায় সহজবোধ্য উপমায় সাহায্যেও দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, "স যথা সর্বাসাম্ অপাং সমুদ্র একায়নম্, (বৃহদারণ্যক ২।৪।১১, ৪।৫।১২), সকল জলের যাইবার একমাত্র আধার যেমন সমুদ্র, স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকম্ এব অনুবিলীয়েত, (বৃহদারণ্যক ২।৪।১২), লবণ খণ্ড জলে ফেলিলে যেমন জলে মিলাইয়া যায়, মৃত্যুর অর্থ তাহাই, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি, (বৃহদারণ্যক ২।৪।১২, ৪।৫।১৩), মৃত্যুর পরে এই সংজ্ঞা আর থাকে না।

তাহা যদি সত্য হয়, তবে একথা কি মনে করিতে হইবে যে, অদ্বিতীয় ব্যাঘ্ররূপে নিজ মৃগরূপকে সংহার করিতেছেন, দুষ্টরূপে নিজ শিষ্ট রূপকে উত্ত্যক্ত করিতেছেন, শক্তিধররূপে নিজ শক্তিহীনরূপকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন? উত্তর—ইহাই ঠিক বটে।

প্রশ্ন আসিতে পারে যে, যদি সবই ঐশী সত্তা, ঐশী শক্তি, ঐশী ইচ্ছা, তাহা হইলে মানুষের মনে কেন এ-ধারণা আসে যে একটা সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে, একটা দেব-দানবে যুদ্ধ চলিতেছে, শান্তির ও অশান্তির পরস্পর বিপরীত ধর্মী স্রোত বহিতেছে? প্রশ্নটি ভিন্নভাবেও করা চলে। মানুষের বোধ কেন এরূপ হয় না যে, যাহা কিছু আছে তাহা সুন্দর, যাহা কিছু ঘটে তাহা সামঞ্জস্যময়? প্রশ্নটির উত্তর এই যে, ইহার উত্তর নাই। ঐশী ইচ্ছাতেই এইরূপ হয়, কেন ঐশী ইচ্ছা এইরূপ তাহা আমরা জানি না। আমরা যেন একটি ঘরের মধ্যে বাস করি, সেই ঘরের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না, বাহির হইতে ঘরটি কিরূপ দেখা যায় তাহা আমরা জানি না। আমরা যে ঐশী ইচ্ছায় চালিত, সে ঐশী

ইচ্ছার স্বরূপ বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

প্রশ্ন আসিতে পারে, তাহা হইলে কি ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করার অর্থ হয় না? যুগ যুগ ধরিয়া যে ঈশ্বর-অন্বেষণে সাধুসন্তগণ জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন, সেই ঈশ্বর-অন্বেষণে কি তাৎপর্যহীন? উত্তর— তিনি সর্বক্ষণই জানা, তাঁহাকে জানিবার জন্য চেষ্টা করার অর্থ হয় না, উহা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র, যেমন আকাশকে স্পর্শ করার জন্য চেষ্টার অর্থ হয় না, উহা ব্যর্থ-প্রয়াস। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে (কঠ ২।৩।১২), "অস্তি" আছেন, এইটুকু মুখে বলা ভিন্ন তাঁহাকে নিকট পাইবার উপায় কি আছে? অন্যদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, তিনি ছড়াইয়া রহিয়াছেন, এমন কিছু নাই যাহাতে তিনি নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু সবই তিনি। যাহাই দেখা যায় তাহাই তিনি, যাহাই শোনা যায় তাহাই তিনি, যাহাই আঘ্রাণ করা যায় তাহাই তিনি, যাহাই আস্বাদ করা যায় তাহাই তিনি, যাহাই স্পর্শ করা যায় তাহাই তিনি। এই দর্শন শ্রবণাদি আরও সূক্ষ্মভাবে করার প্রয়াস সম্ভব বিজ্ঞান চর্চায়, বিজ্ঞান সাধক-গণের আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে— বিজ্ঞানচর্চা ঐশী শক্তির সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার প্রকৃষ্ট উপায়; এই দৃষ্টিতে ঈশ্বরকে জানিবার চেষ্টা সার্থক।

প্রশ্ন আসিতে পারে, এই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সহিত বহু দেব-দেবীর পূজা-উপাসনা; তথা মূর্তি-পূজা সম্বলিত প্রচলিত হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের কিংবা একেশ্বর উপাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক কি? উত্তর— ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ মতে ঐ উভয় ধর্মবিশ্বাসই ভ্রান্ত। ঐ উভয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিই পৃথক্ ঈশ্বরে বিশ্বাস— ভিন্নবোধে পৃথক্ ঈশ্বরের পূজা করা, উপাসনা করা। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূল কথা, যঃ অন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অসৌ অন্যঃ অহম্ অন্যঃ ইতি, ন স বেদ, যিনি ভিন্নবোধে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তিনি অজ্ঞ. যে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এ-বিষয়ে ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসের ভ্রান্তি গুরুতর। প্রচলিত হিন্দু ধর্মবিশ্বাস স্বীকৃতি মতেই নানাভিত্তিক। ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাসের প্রবর্তক রামমোহন রায় হিন্দুগণের প্রতিমা-পূজা ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া উপ-নিষদে যে ব্রহ্মের উল্লেখ আছে, সেই ব্রহ্মের উপরে ভিত্তি করিয়া ব্রহ্ম-বাদ প্রচার শুরু করিলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি এক

ব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। উপনিষদে ব্রহ্মের পূজার বা উপাসনার ব্যবস্থা নাই, এক ব্রহ্মের পূজা বা উপাসনা হয় না। একে পূজা সম্ভব নয়, দুই ভিন্ন পূজা হয় না— পূজক ও পূজিত উপাসক ও উপাস্য পৃথক্ হইতে হয়।

প্রশ্ন আসিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ কি নাস্তিকতা নয়? পাপপুণ্য নাই, পুনর্জন্ম নাই, স্বর্গনরক নাই, পূজা-উপাসনা অর্থহীন— এইসব কথা বলা কি নাস্তিকতা নয়? এ প্রশ্ন আসে, "নাস্তিকতা" শব্দটির অর্থ না বুঝিবার ফলে। "নাস্তিকতা" শব্দটির অর্থ ন অস্তি, ঈশ্বরঃ ন অস্তি, ঈশ্বর নাই, এই মনোভাব, এই মতবাদ। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ কোনওক্রমেই এ-জাতীয় মনোভাবের সমর্থন করে না। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ মতে সর্বমীশ্বরময়ং জগৎ, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরময়, জগৎ ঈশ্বরহীন, একথা নয়, জগৎ ঈশ্বরময়, ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এতদপেক্ষা আস্তিকতা আর কি হইতে পারে? নাস্তি নয়, অস্তি, শূন্য নয়, একের নিচে শূন্য। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে ঈশ্বরকে লইয়া চিন্তা করিবার, ব্যস্ত হইবার কিছু নাই। খণ্ডিত করুণাময় ঈশ্বর কল্পনার স্থান ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে নাই।

প্রশ্ন আসিতে পারে, এই অধ্যাত্মবাদ কি অন্যায় কর্মের, যথেচ্ছাচারের সমর্থক নয়? যখন কৃতকর্মের ফল মৃত্যুর পরে ভোগ করিতে হয় না, যখন ন কর্ম লিপ্যতে নরে, তখন তো কেহ ইচ্ছামতো অন্যায় কর্ম করিতে পারেন, নরকযন্ত্রণা ভোগের ভয় তো নাই!

একথা স্বীকার্য যে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এইরূপ অপপ্রয়োগ সম্ভব। এই অপপ্রয়োগের অন্যতম উদাহরণ রামায়ণে চিত্রকূট পর্বতে বনবাসী দাশরথি রামের নিকট অমাত্য ব্রাহ্মণ জাবালির উক্তি; রাম পিতৃসত্য রক্ষার জন্য বনে গিয়াছেন, ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য গিয়াছেন, ভরতের সহিত বহু অযোধ্যাবাসী গিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রয়াত রাজা দশরথের অন্যতম অমাত্য জাবালিও আছেন; রাম ভরতের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলে, জাবালি ভরতকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা, কঃ কস্য পুরুষঃ বন্ধুঃ কিংকার্যং কস্য কেন-

চিৎ, যৎ এ কো জায়তে জন্তুঃ এক এব বিনশ্যতি, তস্মাৎ মাতা পিতা চ ইতি সজ্জেত যো নরঃ, উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ঃ, ন তে কশ্চিৎ দশরথঃ ত্বং চ তস্য ন কশ্চন, অন্যো রাজা ত্বম্ অন্যঃ, বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ সংসৃক্তম্ ঋতুমত্যা মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ, স তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে, (অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮।২—১১), কে কা'র, জন্ম একা, মৃত্যুও একা, পিতার ও মাতার প্রতি আসক্ত হওয়া পাগলামি, দশরথ তোমার কেউ নন, তুমিও দশরথের কেউ নও, পিতার বীজ মাতার দেহে যুক্ত হোয়ে পুরুষের জন্ম হয়, অতএব, এই অর্থহীন বুদ্ধি কোরো না, ভরত যা' বলছে, তা'ই করো। অধ্যাত্মবাদের দৃষ্টিতে এই যুক্তি অকাট্য মনে হইতে পারে। অপর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ মহাভারতে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্কালে অর্জুনের প্রতি বসুদেব কৃষ্ণের উক্তি। সমরক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যুযুৎসু দুই বাহিনী সমাবিষ্ট, এই অবস্থায় একতর পক্ষের প্রধান যোদ্ধা অর্জুন উপলব্ধি করিলেন যে, এই সমরে নিকট আত্মীয়স্বজনকে হত্যা করিতে হইবে, এবং সমীপস্থ আত্মীয়-বন্ধু-রথসারথি বাসুদেব কৃষ্ণকে বলিলেন, ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে (৬।২৫।৩১), যুদ্ধে স্বজন হত্যায় কোনও কল্যাণ দেখছি না, বলিলেন, ন যোৎ স্যে (৬।২৬।৯), যুদ্ধ করবো না ; পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখিয়া বাসুদেব কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে সম্মত হইবার জন্য নানা যুক্তি দেখাইলেন, অপরাপর কথার মধ্যে বলিলেন, অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্ (৬।২৬।১৭), যাঁহা দ্বারা এই সমস্তই ব্যাপ্ত তাঁহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব হত্যাকে হত্যা মনে না করিয়া যুদ্ধ করো।* চার্বাক-মত বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাও এই শ্রেণীর – ভস্মীভূত শরীর যখন আর ফিরিয়া আসে না, তখন ঋণ করিয়া ঘৃত খাও।

এইসব উক্তি, যুক্তি, মত, দুই ভিন্ন শ্রেণীর ধারণার বিবেচনার, অপমিশ্রণ— অর্জুনের ভাষায় ব্যামিশ্রণ (৬।২৭।২), যাহাতে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ বিশ্বের স্বরূপ লইয়া, উহা আমাদিগকে মৃত্যুর পরপার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে, বলে, মৃত্যুর পরে কী

* এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে স্থান পাইয়াছে, এবং আশু প্রকাশনের মুখে "গীতা কি ধর্মগ্রন্থ ? নামক পুস্তকেও করা হইতেছে। মৎপ্রণীত ***The Gita a Religious Book*** ? নামক ইংরাজি গ্রন্থও এই বিষয় লইয়া রচিত।

হইবে সে-কথা লইয়া ভাবনার কিছু নাই। মৃত্যুর পূর্বে কী করণীয়, কী করণীয় নয়, সে-বিষয়ে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের কোনও ভূমিকা নাই। সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার নিজ বিচারবুদ্ধির, সে-বিচারবুদ্ধি ঐশী ইচ্ছাতে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অন্তর্নিহিত— সে-কথাও অবশ্য ভারতীয় অধ্যাত্মবাদই স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করে, যখন বলে, সর্বং হ্যেতদ্‌ ব্রহ্ম। এই বিচারবুদ্ধি ঐশী বিচারবুদ্ধি, সংসার সমুদ্রে আমাদের নৌকার একমাত্র হাল। মনুষ্যরূপে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোকপাত করে স্বকীয় বিচারবুদ্ধি। যখন পাপপুণ্য নাই, তখন ন্যায়-অন্যায় নাই, একথা ঠিক নয়। বাসুদেব কৃষ্ণ ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে অর্জুন যে নর-হত্যা, স্বজনহত্যা, করিবেন তাহাতে পাপ নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে ভিন্ন নরহত্যা অন্যায়, মানুষের অকরণীয়। জাবালি যে দাশরথি রামকে বলিয়াছিলেন, দশরথ রামের কেহই নন, পিতা পুত্রের কেহই নন, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ মতে ইহা যথার্থ, কিন্তু পিতৃসত্য রক্ষা করা পুত্রের কর্তব্য কি না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র, সে প্রশ্নের উত্তর রামের ভাষায়— ভবান্‌ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্‌, অকার্যং কার্যসঙ্কাশম্‌ অপথ্যং পথ্যসম্মিতম্‌, (২।১০৯।২), আমার ভালো মনে কোরে আপনি যা' বললেন, সেটা কাজের মতো দেখতে অকাজ। ভস্মীভূত শরীর ফিরিয়া আসে না, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে ইহাই চরম সিদ্ধান্ত, কিন্তু ঋণ করিয়া ঘৃত খাইব কি না!, সেকথা মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিতে হইবে। পরলোক না থাকায় ইহলোকের প্রশ্ন, মনুষ্যত্বের প্রশ্ন, আরও বড়ো হইয়া ওঠে, ছোটো হয় না।

আমরা সেই প্রশ্নে ফিরিয়া আসিলাম, যে-প্রশ্ন লইয়া বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত—কঃ পন্থাঃ, পথ কি? কোন্‌ পথ অনুসরণীয়, কোন্‌ পথ আদর্শ? সংসারে দুইটি পথ উন্মুক্ত, একটি স্ববিচারসম্মত কর্মের পথ, অপরটি ভগবত্তন্ময়তার পথ। একটি বিদ্যাসাগরের পথ, অপরটি রামকৃষ্ণের। এই পথনির্বাচনে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের উত্তর কি, দর্শন কি বলে?

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ চক্ষুর সম্মুখ হইতে উর্ণনাভের জাল সরাইয়া দিয়াছে, মিথ্যা বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। বলে, ঐশী সত্তা, ঐশী শক্তি, ঐশী কামনা এই জীবদেহরূপেই প্রকট, জীবই শিব, শিবই

জীব। মৃত্যুর পরে কি হইবে, এ-প্রশ্ন আমাদের নয়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ কি করিয়া করিব, এ-প্রশ্ন আমাদের নয়। আমাদের প্রশ্ন, কি করিয়া মনুষ্যোচিত জীবনযাপন করিব, আমাদের কর্তব্য স্বীয় বিচার-বুদ্ধির নির্দেশে শ্রেয়ঃ অনুসরণ।

স্ব-স্ব বিচারবুদ্ধির আলোকসম্পাতে স্ব-স্ব কার্যাকার্য স্থির করিতে হবে। মনে প্রশ্ন জাগিল, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করিব, কি না। বিচারবুদ্ধি বলিল, আমি যদি হত্যা করি, অপরে আমাকে হত্যা করিতে পারে, এইভাবে পরস্পর-হনন চলিলে বাঁচিয়া থাকা অনিশ্চিত হইবে, সুখ-শান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না; বিচারবুদ্ধি আরও বলিল, বিনা অপরাধে লোকটিকে হত্যা করিব কেন? তবে, যদি লোকটির দোষ থাকে, সে-স্থলে বিচারবুদ্ধি বলিয়া দেয়, এখানে হত্যা করিতে হইবে। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে নরহত্যা করিলাম, বা, করিলাম না, তাহা স্বকীয় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে ন্যায়-অন্যায় বোধে — পাপপুণ্যের প্রশ্ন নাই। লোভ-পরবশ হইয়া কাহাকেও ঠকাইবার ইচ্ছা হইল; বিচারবুদ্ধি বলিল, আমি যদি ঠকাই, অপরেও আমাকে ঠকাইতে পারে, এবং পারস্পরিক প্রতারণা চলিতে থাকিলে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে; বিচারবুদ্ধি একথাও যেন বলিতে থাকে, না, এ পথ ঠিক নয়, সোজা পথে চলাই ভালো। সুতরাং প্রতারণা পরিহার করিলাম অন্যায় জ্ঞানে, পাপের প্রশ্ন তুলিয়া নয়।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ শুষ্ক জ্ঞান বিতরণ করে না। ইহা জগৎ-সংসারকে মায়া বলিয়া বিবেচনা করিয়া হাত পা গুটাইয়া থাকিবার পরামর্শ দেয় না; ইহা শিক্ষা দেয় যে, এই অনুভূতিস্পৃষ্ট জগৎ আমাদের কর্মক্ষেত্র, চক্ষু বুঁজিয়া মানসপথে অন্য কিছুর অন্বেষণ আমাদের পথ নয়, এই পৃথিবীতেই আমাদের চলিতে হইবে, এই জীবিত অবস্থাতেই আমাদের কাজ করিতে হইবে স্বীয় বিচারবুদ্ধির অনুসরণে। এই পৃথিবীকে স্বর্গ করিব, কি, নরক করিব, তাহা আমাদের অভিরুচির উপর নির্ভর করিতেছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, অনেক মানুষ স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুসারে চলেন না, প্রকৃতিগত ষড়বর্গ দ্বারা অপচালিত হন। কাম ক্রোধাদি বলবান্ ইন্দ্রিয়েশ মন রূপ অভীষু দিয়া ইন্দ্রিয়-হয়গুলি সংযত রাখা অনেকে করেন না, করিতে পারেন না। এই কারণে মনুষ্য সমাজের পক্ষে হিতকর

বলিয়া বিবেচিত পথে মনুষ্যগণকে যথাসম্ভব রাখিবার জন্য দণ্ডের ভয় প্রয়োজন। এইজন্য প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে রাজার অস্তিত্ব আবশ্যিক বিবেচিত হইত, দণ্ডদাতা রাজা অপরিহার্য বিবেচিত হইতেন। রামায়ণের বিবরণে রাজা দশরথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে রাজকর্তৃগণ চিন্তিত হইলেন— অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সম বা প্নুয়াৎ (২।৬৭।৮), অরাজক অবস্থায় আমাদের এই রাষ্ট্র বিনষ্ট হইবে। মহাভারতের বিবরণে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অবসানে, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে শোকব্যাকুল চেতন যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণ করার পরিবর্তে বনচারী হইবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে, অর্জুনের উক্তিতেও এই চিন্তা প্রকট— ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ দণ্ডস্যৈব ভয়াদেতে মনুষ্যা বর্ত্মনি স্থিতাঃ (১২।১৫।১২) দণ্ডের ভয়েই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, সকল মানুষ ঠিক পথে থাকেন। দণ্ডের ভয় যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আসে, ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মনে যে ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আগত দণ্ডভয় কাজ করে, অর্জুনের উক্তিতে এ-বিষয়ও প্রকাশ পাইল— রাজদণ্ড ভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে, যমদণ্ড ভয়াদেকে পরলোক ভয়াদপি, পরস্পর ভয়াদেকে পাপাঃ পাপং ন কুর্বতে (১২।১৫। ৫, ৬), কেউ রাজদণ্ডের ভয়ে, কেউ পরলোকে যমদণ্ডের ভয়ে, কেউ বা পরস্পরের ভয়ে, অন্যায় হইতে বিরত থাকেন। সাধারণ মানুষের মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুষ্ট। যে-সকল মানুষের মনে রাজদণ্ডের ভয় বা অপর মানুষের ভয় কার্যকর হয় না, সেই সকল মানুষের ক্ষেত্রে পরলোকের ভয়, যমদণ্ডের ভয়, কার্যকর হইতে পারে। দুষ্টকে শিষ্টপথে রাখিবার জন্য পরলোকের ভয় প্রদর্শনের প্রয়োজন বিবেচিত হইতে পারে। সেক্ষেত্রে পরলোকের ভয় যেন পথের দু'পাশে বেড়ার কাজ করে, পাছে কেহ পথ ভুলিয়া বিপথে চলিয়া যান, কতকটা যেন ছাগলের গলার তেকাঠা বাঁধিয়া দিবার মতো, পাছে সে অপরের বাগানে ঢুকিয়া পড়ে, কতকটা যেন শিশুকে জুজুর ভয় দেখানোর মতো, পাছে সে বিপদে পড়ে। পরলোকে বিশ্বাসের, প্রত্যগাত্মায় বিশ্বাসের সার্থকতা এইখানে, ভ্রান্ত হইলেও ইহা অপুষ্টমানস মানুষের পক্ষে হিতকর। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ সকল মানুষের ধাতে সহ্য হয় না, সাধারণ মানুষ সূর্যের আলোকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন, তা'ই পৃথিবী সূর্যের দিকে পিছন ফিরাইয়া আলোকাভাসিত সৌরজগতে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করে।

কেবল এই সীমাবদ্ধ অর্থেই বিদ্যাগুপ্তির সার্থকতা— যে বিদ্যাগুপ্তি রক্ষার জন্য বৃহদারণ্যকের বিবরণে জৈবলি প্রবাহণ গৌতম আরুণিকে উপদেশ দিয়াছিলেন, নাপুত্রায় বানন্তেবাসিনে বা ব্রূয়াৎ (৬।৩।১১), মানব ধর্মশাস্ত্রেও যাহা উপদিষ্ট, শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্ অসূয়কায় মাং মা দাঃ (২।১১৪)। অনাবিল সত্য সকলের নিকট প্রকাশ করিবার নয়, সকলে জানিলে হয়তো বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িতে পারে।

তথাপি, সত্যপ্রচারের প্রয়োজন আছে। সত্যকে বারবার চাপা দিলে, আড়াল করিলে, মিথ্যা সত্যের স্থান অধিকার করিবে, সত্যানুসন্ধীর পক্ষে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা আয়াসসাধ্য হইবে। সত্যকে বলি দিয়া মিথ্যাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে কোনও কারণই সঙ্গত কারণ নয়।

হাত দিয়া চোখ ঢাকা দেওয়া অনুচিত হইবে। মূল সমস্যা কঃ পন্থাঃ, উহার সম্মুখীন হইতে হইবে। স্থির করিতে হইবে, কোন্ পথে মানুষ চলিবে, সত্যের পথে, না, মিথ্যার পথে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের পথে, না, ঈশ্বরতন্ময়তার পথে, বিদ্যাসাগরের পথে, না, পরমহংসের পথে? স্থির করিতে হইবে, কি করিতে চাই— কর্মের পথে যাইব, না, ধর্মবিশ্বাস রঞ্জিত আলস্যের পথে, পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে গিয়া সেবা করিব, না, পীড়িতের আর্তনাদে চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া "কালী", "কালী" বলিয়া হাততালি দিয়া নাচিয়া সময় কাটাইব, পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জন করিয়া দুঃখীর সাহায্য করিব, না, কর্মবিমুখ হইয়া অপরের আশ্রয়ে দিনাতিপাত করিব, শিক্ষাবিস্তার ও বিজ্ঞানচর্চা করিব, না, ঈশ্বরকে জানিলেই সব জানা হয় এইকথা জনে জনে প্রচার করিব?

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ মানুষের মন হইতে অহেতুক ভীতি, অহেতুক ভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়, কুজ্ঝটিকা নাশ করিয়া সত্যস্বরূপ সূর্যকে প্রকাশ করিয়া দেয়। সেই সত্যের আলোকে আমরা যেমন এক অস্তিত্বের, এক ইচ্ছার, এক শক্তির সর্বময়ত্ব উপলব্ধি করি, সেই সঙ্গে উপলব্ধি করি যে, মানুষের চলিবার পথ এইখানেই, অন্তরালে নয়, এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়া, এগুলিকে বিকল করিয়া নয়, অনুভূতিগত জগৎকে স্বীকার করিয়া, অস্বীকার করিয়া নয়।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ অঙ্গুলি হেলন করিয়া দেখাইতেছে মানুষের

জন্য একমাত্র পথ কর্মের পথ। সে-পথে দিঙ্‌নির্দেশক মানুষের বিচার-বুদ্ধি। বিচারবুদ্ধি কর্মের বৈচিত্র্যময় পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে, নির্বাচন নিজের। প্রদীপ হস্তে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রদীপটি নিজের, হালটি নিজের, কষ্টিপাথর নিজের।

বিচারবুদ্ধি বলে, আমরা মনুষ্য। মনুষ্যত্ব অর্জন আমাদের পক্ষে সম্ভব, মনুষ্যত্ব অর্জনই আমাদের অনুসরণীয় আদর্শ। সেই মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে বর্তিকাহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন বিদ্যাসাগর। অদম্য উৎসাহের সহিত নিজের উন্নতিসাধন, এবং প্রাণ দিয়া অপরের উন্নতি-সাধন, ইহাই বিদ্যাসাগরীয় আদর্শ।

ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, ধর্মবিশ্বাসের পথ রক্তকলঙ্কিত, ধ্বংস-স্তূপাকীর্ণ, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষে যুগে যুগে পৃথিবীর ধূলি রক্তরঞ্জিত, ধূলিচূর্ণে ধূসরিত। সেই অতীতের কথা চিন্তা করিয়া বিশ্বাসের ভ্রান্ত পথ বর্জন করিয়া বিচারবুদ্ধির পথ অবলম্বন করার সময় আসিয়াছে।

ঈশ্বরের নামে শঠতা শঠতার চরম— সে-শঠতা ইচ্ছাকৃতই হউক, অজ্ঞতাপ্রসূতই হউক। তথাপি সেই শঠতাই সর্বযুগে সর্বদেশে সম্মানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ইহার কারণ, মানুষ মিথ্যা বিশ্বাসপ্রবণ জীব, মিথ্যা বিশ্বাসের আস্তরণ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণেই ঋষির আকুলতা—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্, তৎ ত্বং পূষন্ন অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে (বৃহদারণ্যক ৫।১৫।১), সত্য আপাত-মনোহর মিথ্যার আবরণে আবৃত, হে সূর্য, সেই আবরণ সরাইয়া দাও, সত্যধর্ম দৃষ্টির পথে আসুক।

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

(১) অজানিতের ডায়রী : প্রথমা, ব্যাধি বিলাসী
(২) পরীক্ষিৎ
(৩) পথবাসী গীতি-দীপালি
(৪) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
(৫) মনুসংহিতায় বিবাহ
(৬) সংসার পথে
(৭) পশ্চিমবঙ্গ ইদানীং
(৮) মরু-কারা (কবিতা)
(৯) বাঁচতে চাও তো হেসে মরো (ব্যঙ্গ কবিতা)
(১০) ভারতীয় ডিমক্রসি, পশ্চিমবঙ্গ (যন্ত্রস্থ)
(১১) গীতা কি ধর্মগ্রন্থ ? (যন্ত্রস্থ)
(১২) *Intermediate Leading Cases*, (by Ray and Mallick) 1937
(১৩) *The Hindu Marriage Act, 1955, in the light of the Institutes of Manu*, 1957
(১৪) *Two Men and Two Paths*, (Sri Ramakrishna and Vidyasagar)
(১৫) *The Gita—A Religious Book* ?
(১৬) *India—A Democracy*
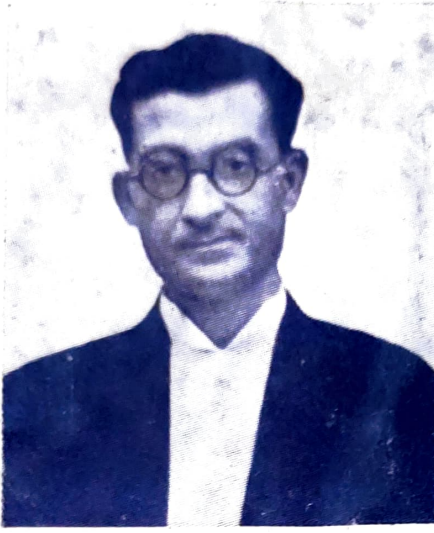
বিদগ্ধ, বিশ্রুত আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমলকুমার রায়ের জন্ম ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মে অবিভক্ত ভারত-ভূখণ্ডে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দাত্তপুর গ্রামে। পঠন-পাঠন কলকাতায় এবং বিশেষভাবে তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ও উজ্জ্বল রত্নদের অন্যতম ছিলেন শ্রীযুক্ত রায়। কর্মজীবনেও কীর্তিত ও ন্যায়নিষ্ঠ আইনজ্ঞরূপে কলকাতা স্মল-কজ-কোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পরও কয়েক বছর দিল্লিতে ল্যাঙ্গুয়েজ কমিশনের সদস্যের গুরুত্বপূর্ণ পদে বৃত হয়েছিলেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও অনুপম হৃদয়-লাবণ্যের বিকিরিত প্রভায়।

উচ্চ ন্যায়াধীশ ও অনন্য প্রতিভাশালী আইনজ্ঞরূপে যেমন, সাহিত্যের সর্বশাখায় তেমনি তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য, অনুশীলন ও নিরলস চর্চার ফলশ্রুতিস্বরূপ অসামান্য অবদান রেখেছেন একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থে—যেমন বিষয়-গৌরবে তেমনি তাৎপর্যময় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। দীক্ষিত ও রুচিশীল পাঠক মাত্রই এই উক্তির সমর্থন লাভ করবেন বাংলার ভাব-বিপ্লবী দুই চিন্তানায়কের সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ এই "বিদ্যাসাগর ও পরমহংস" গ্রন্থে॥